লবণহ্রদের ইতিকথা

সুশীল কুমার রায়চৌধুরী

সুজন পাবলিকেশন
কলিকাতা-২৯

প্রকাশকাল :
বৈশাখ ১৩৯৪
April 1987

প্রকাশক :
তপন কুমার মুখোপাধ্যায়
সৃজন পাবলিকেশন
প্রযত্নে সেলস এ্যালায়েন্স
৭বি, লেক প্লেস
কলিকাতা-৭০০০২৯

প্রচ্ছদ :
পূর্ণেন্দু পত্রী

মুদ্রাকর :
শ্রীবিজয়কৃষ্ণ সামন্ত
বাণীশ্রী
১৫/১, ঈশ্বর মিল লেন
কলিকাতা-৭০০০০৬

বিধান নগরের বর্তমান ও

ভবিষ্যাত আবাসিকদের উদ্দেশ্যে

বিষয়সূচী

ভূমিকা

বিদেশ থেকে ফিরে এসে লবণহ্রদে ছোট্ট একটুখানি বাসা বাঁধলাম—বহুদিন থেকে মনের গহনে যে আশা দানা বেঁধেছিল বিশেষ করে বাংলাদেশে পিতৃপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে আসার পর থেকে সেটা আংশিক পূরণ হল। বাসা বাঁধবার পর থেকেই যে মাটির ওপর ভিত গড়েছি তাকে জানবার জন্য তার অতীত ইতিহাস উদ্ঘাটন করবার জন্য মনটা সব সময় আনচান করত। তাই দুপুরের মাঠ ফাটানো রোদেও বেড়িয়ে পড়তাম ভেড়ির সন্ধানে। লোকের মুখে শুনতাম আমাদের এই সল্টলেক বর্ত্তমান বিধাননগর ভেড়ি ভরাট করে তারই উপর দাঁড়িয়ে আছে। ভেড়ি পদার্থটি কি, তার সৃষ্টি রহস্য জানবার জন্য গ্রাম হতে গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়িয়েছি। গিয়েছি পাগলা ডাঙ্গায়, দেখে এসেছি বাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল, সরেজমিনে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য পায়চারী করেছি কেষ্টপুর খালপার ধরে—মহিষবাথানের গ্রাম্য পরিবেশে।

এত সব ঘোরাঘুরি করেও কিন্তু লবণহ্রদ নাম হল কেন—কবে থেকে লবণহ্রদের নাম হল সল্টলেক—সল্টলেক লবণহ্রদের ইংরেজী পরিভাষা না লবণহ্রদ সল্টলেকের বাংলা অনুবাদ এই ধাঁধা এখনও রয়ে গেছে।

লবণহ্রদের লবণের অস্তিত্ব বিশেষ কোথাও দেখা যায়নি—যদিও সুন্দরবনের অনেক যায়গায় 'নিমকখামারী' বলে চিহ্নিত করা আছে—যেখানে লবণ তৈরী হত—সমুদ্রের জল থেকে এবং ব্যবসা ভিত্তিক ভাবে এর অস্তিত্বের কথা জানা যায়।

লবণহ্রদের অতীতের খোঁজে বেশ কিছুদিন যাতায়াত করেছি জাতীয় গ্রন্থাগারে—সেখানে যেটুকু খোঁজ পেয়েছি তা হল ইংরেজের লেখা রাজস্ব বিভাগের হিসেব-নিকেশের তথ্য সম্বলিত দু' একখানা বই'র ভূমিকায়। অতীতের কথা বলতে গিয়ে অনেক জায়গায় কিংবদন্তী অথবা কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়েছে—এইসব কারণেই বইটির নামকরণ লবণহ্রদের ইতিহাস না করে ইতিকথা করা হয়েছে—যাতে কল্পনার কিছুটা স্থান করে নেওয়া যায়। এই কল্পনার সূত্র ধরে যেটুকু গ্রথিত করা সে সবই প্রযোজ্য অতীতের কাহিনী অংশতে।

১৯৬২ সালের ১৬ই এপ্রিল সল্টলেক তথা বিধাননগরের জন্মদিন—সেদিন থেকে প্রয়াস চালান হয়েছে যতটা সম্ভব তথ্যনির্ভর বিবরণ পেশ করবার।

এই তথ্য সংগ্রহ করতে জাতীয় গ্রন্থগারে সংগৃহীত মাল মশলা থেকে আর সল্টলেকের আবাসিকদের কাছ থেকে যাঁরা এখানে আছেন সল্টলেকের গোড়াপত্তন থেকে—এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য দুটি নাম সর্ব্বশ্রী জীতেন চক্রবর্ত্তী ও শরদিন্দু চ্যাটার্জি। তথ্য সংগ্রহে সাহায্য পাওয়া গেছে দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে ব্লকে ব্লকে দুর্গাপুজা উপলক্ষে প্রকাশিত স্বভেনীর থেকে।

লবণহ্রদের ইতিকথার প্রকাশ সম্ভব হচ্ছে কয়েকজন শুভানুধ্যায়ী বন্ধু ও কয়েকজন স্নেহভাজন সাহিত্যানুরাগীর উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায়। লবণহ্রদের ইতিকথা ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়েছে বিধাননগর সংবাদে। এই সময় একদল সমালোচক ছিলেন যাদের একমাত্র কামনা ছিল এর অপমৃত্যু আর একদলের কাছ থেকে পেয়েছি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা। তবে একটি বিষয় সব দলই একমত সেটা হল আমার ভাষার দুর্ব্বলতা—সেখানে আমিও তাদের সঙ্গে পরিপূর্ণভাবে একমত।

আমি নিজে সাহিত্যিক নই, তা সত্বেও সাহিত্য সেবার অধিকার থেকে আমাকে বঞ্চিত করার অধিকার কারও থাকতে পারে না। এটা অন্যান্য সাহিত্য পথযাত্রীর মত আমারও থাকতে পারে এবং আছে—সেই অধিকারের বলেই আমি শুধুমাত্র নতুন কিছু সৃষ্টি করার উদগ্র বাসনা, এক বিরাট উন্মাদনা নিয়ে ছুটে চলেছি। এই ছোটার মধ্যে আনন্দ পেয়েছি প্রচুর। চঞ্চলা চপলা নদী বিদ্যাধরী তার প্রবল গতিবেগে পথে হারিয়ে লবণহ্রদের জলাভূমিতে যে আবর্ত্ত সৃষ্টি করেছিল তারই ফলে সৃষ্টি হল ভেড়ি—এই ভেড়িকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠল মৎস্য কেন্দ্র—তৈরী হল এক জনপদ জেলেজন, আলাজন, মেয়েজনদের নিয়ে আর নতুন এক ধনীসম্প্রদায় মাথা চাড়া দিয়ে উঠল যখন মাছের ব্যবসা চলছিল রমরমা। তখনই ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের দৃষ্টি পড়ল লবণহ্রদের বিস্তীর্ণ জলাভূমির ওপর—লবণহ্রদের অগণিত ভেড়ির ওপর। হল্যাণ্ড সফরের সময় রাইন নদীর তীরে ডাঃ রায়ের মনে যে ভাবনা জেগেছিল সেটাই জন্ম নিল লবণহ্রদের জলাভূমিতে ১৯৬২ সালের ১৬ই এপ্রিল। ভেড়ি ভরাট করা হল—নতুন শহর বিধাননগর রূপায়িত—হল, গৃহহারা বাঙালীরা আশ্রয় পেল।

ধীরে ধীরে শহর জমজমাট হয়ে উঠল! লবণহ্রদের ইতিকথা কাল্পনিক স্তর ছাড়িয়ে বাস্তব জগতে পদক্ষেপ করল।

যুগশ্লাভ কোম্পানীর সঙ্গে চুক্তি—গঙ্গাবক্ষে দেখা দিল ১৯ খানা জাহাজ, বেলুড় মঠ থেকে দক্ষিণেশ্বর এবং বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে শুরু হল এক বিরাট গঙ্গাবক্ষ থেকে পলিমাটি এনে ভরে দিল একের পর এক ভেড়ি—এই বালি

ভগাট ভেড়িতে লবণহ্রদের জলাভূমি হল বালুর মাঠ—আস্তে আস্তে নিপুণ স্থপতি—শিল্পীর হাতে তৈরী হল এক সুন্দর সুঠাম, পরিচ্ছন্ন শহর। বালুর মাঠ ভরে উঠল সবুজ আস্তরণে—সৃষ্টি হল সুন্দর পরিবেশ। রাস্তার দুপাশে শোভা পেল দেবদারু ও কৃষ্ণচূড়ার গাছ। কবির কণ্ঠে উচ্চারিত হল গানের ভাষায় "ভোরের আলোটি উঁকিঝুঁকি মারে দেবদারু গাছের পাতায়, সাঁঝের আলোটি ঝলমল করে কৃষ্ণচূড়ার শাখায়।"

একে একে আবাসিকরা নতুন শহরে নতুন পরিবেশে নতুন জীবন শুরু করল। বারমাসে তেরো পার্ব্বণ চালু হল আলো ঝলমল এ শহরের ব্লকে ব্লকে—বাঙ্গালীর জাতীয় উৎসবে মহামায়ার আবির্ভাব—এক নতুন প্রাণ সঞ্চার করল বালুর মাঠে, লবণহ্রদে সল্টলেকে তথা বিধাননগরে।

এটা বলে রাখা ভাল যে লবণহ্রদের ইতিকথার সমাপ্তি টানা হল ১৯৮০ সালের ঘটনার বিবরণ দিয়ে। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে শুরু করে ১৯৮০ পর্য্যন্ত যতটুকু ঘটনা যা কিছু বিবরণ সংগ্রহ করতে পেরেছি তাই সাধ্যমত লিপিবদ্ধ করে লবণহ্রদের ইতিকথার প্রথম খণ্ড প্রকাশকের হাতে তুলে দিলাম।

দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের ইচ্ছে রইল—সাধও আছে প্রচুর—সাধ্যে কুলবে কিনা সেটা ভবিষ্যতের হাতে ছেড়ে দিলাম।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে হবে এটা সাহিত্যিক সমাজের একটা রীতি—তবে আমি যে ভাবে প্রতি পদক্ষেপে বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে স্বতঃস্ফূর্ত্ত সাহায্য পেয়েছি তাদের সকলের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে গেলে হয়ত একটা পৃথক পরিচ্ছেদ চালু করতে হবে। তাই যাঁদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য তাঁদের দু' একজনের নাম উল্লেখ করেই কৃতজ্ঞতা পর্ব্ব শেষ করব।

প্রথমেই মনে পড়ে ডঃ অজিত ঘোষের কথা—তিনি তাঁর কর্মব্যস্ত দৈনন্দিন সাহিত্যে জীবনের সময় সূচীতে বেশ খানিকটা সময় দিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে লবণহ্রদের ইতিকথার সমালোচনা করে আমাকে উৎসাহিত করেছেন।

পরপরেই কৃতজ্ঞতা প্রাপ্য অধ্যাপিকা রমা ভট্টাচার্য্যের যিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে ভুলভ্রান্তি শুধরে দেবার চেষ্টা করেছেন—তা সত্বেও যে সব ভুল রয়েছে তার জন্য সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমার নিজের।

২৭শে মার্চ্চ, ১৯৮৭

বিধান নগর

কলিকাতা-৬৪

সুশীল রায়চৌধুরী

ইতিহাসের পাতায়

লবণ হ্রদ শহর—আমরা যাকে বলি সল্টলেক্ সিটি। এ শহরের ভিত্তি হলো অগনিত ভেড়ির লবণাম্বুরাশি। হ্রদের এই বিশাল জলরাশির স্বাদ লবণাক্ত। শহরের প্রাণস্বরূপ এই জলরাশি একদা সঞ্চিত ছিল পৃথিবীর অতলস্পর্শী গহ্বরে। যুগযুগ ধরে সঞ্চিত ধরিত্রীর বক্ষ সঞ্জাত এই লবণাক্ত রস একসময়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে। অ্যারিস্টটলের মতে জলের নোনা আস্বাদ হলো শত সহস্র বছরের জমাট বাঁধা জৈব পদার্থের নির্যাস, ঐতিহাসিক এবং প্রাগৈতিহাসিক জীবজন্তুর অস্থিমজ্জা নিঃসৃত রস ; পৃথিবীর বুকে সঞ্চিত অগাধ জলরাশির মিষ্টি ভাগ মিশে যায় বাতাসের সঙ্গে—ধরণীর স্তর ভেদ করে উছলে পড়ে ঝর্ণা ধারায় পৃথিবীর মানুষের তৃষ্ণা মেটাতে। অনাদি অনন্তকাল হতে জৈবপদার্থ উদ্ভূত লবণাক্ত আস্বাদ লবণাম্বুরাশির উত্তাল তরঙ্গশীর্ষ নৃত্যের তালে তালে এগিয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে পৃথিবীর বুকে—কান পাতলে শোনা যায় বলছে তারা "নুন খাও—গুণ গাও"—কিন্তু অকৃতজ্ঞ মানুষ শুধু নুন খায় গুণ আর গায় না। সমুদ্রের অগাধ জলরাশি চিরন্তনী ভাষায় মানুষকে সতর্ক করে দিচ্ছে "নুন খাও—গুণ গাও", তবু মানুষ নিমকহারামী করে চলেছে যুগ হতে যুগান্তরে। কিন্তু কালপুরুষের হাত থেকে তার নিস্তার নেই। মীরজাফর আলিবর্দীর নিমক খেয়ে সিরাজের সাথে নিমকহারামী করে বাংলার স্বাধীনতা বিকিয়ে দিল পলাশীর প্রান্তরে। ইংরেজের পদতলে তাঁকে মরতে হল কুষ্ঠরোগে, মীরনের মৃত্যু হল বজ্রাঘাতে। দেশের প্রতি নিমকহারামী করে উমিচাঁদ হয়ে গেল উন্মাদ।

লবণ হ্রদের লবণাক্ত আস্বাদ কোথা থেকে এলো, কোথা থেকে উদ্ভূত হল লবণ ? প্রথমেই বলা হয়েছে যে সুন্দরবনের বুক চিরে অসংখ্য নদীনালার মধ্যে দিয়ে সমুদ্রের লবণাক্ত জল শতসহস্র তরঙ্গ ধারায় প্রবাহিত হয়ে ঘাত প্রতিঘাতে তৈরী হয়েছিল বিশাল ভেড়ি।

তাই ভরাট করে বালুকারাশির বুক ফুড়ে জেগে উঠলো এই লবণ হ্রদ। কিন্তু লবণের উৎস কোথায়, এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে আশ্রয় নিতে হয় বৈজ্ঞানিকদের দরবারে। সমুদ্র বিজ্ঞানীদের মতে বরুণদেবের আশীর্বাদ হলো লবণ। যুগ যুগ ধরে মানুষ এবং তার আনুষঙ্গিক জীব মৃত্যুর পরে প্রোথিত হচ্ছে ধরণীর সীমাহীন গহবরে। সেই সব জৈব পদার্থ শত সহস্র বৎসর পরে মাটির সঙ্গে বিলীন হয়ে সমুদ্রের জলের সঙ্গে মিশে যায় এবং সেই লবণাম্বুরাশি তরঙ্গশীর্ষে বহন করে নিয়ে আসে লবণাক্ত আস্বাদ যা পৃথিবীর বুকে প্রতিনিয়ত আছড়ে পড়ে বলতে থাকে "নুন খাও—গুণ গাও"। কিন্তু অকৃতজ্ঞ হিংস্র লোভী মানুষ সে কথায় বিন্দুমাত্র কর্ণপাত করে না। সমুদ্রের উপদেশবাণী সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করে সে দম্ভভরে ঐশ্বর্যের কারাগারের দিকে এগিয়ে চলে। তাই ধরিত্রীও মানুষের মৃতদেহ কালের যন্ত্র দ্বারা নিষ্পেষিত করে; সমুদ্রের দেওয়া যে নুন সে খেয়েছিল এবং সমুদ্রের দানের অমর্যাদা করে, পৃথিবীর বুকে অগনিত জনগণকে বঞ্চিত করে অহমিকার দ্বারা প্ররোচিত হয়ে যে অমানুষিকতা সে করেছিল তাঁর ঋণ শেষ করতে হল মৃত্যুর পর নিজের অস্থিমজ্জা দিয়ে।

লবণ হ্রদ। মৌজা কৃষ্ণপুব। পরগণা সুন্দরবন। জেলা ২৪ পরগণা। ১৯৭২ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এক মন্ত্রীসভায় সর্ব্ববাদী সম্মত সিদ্ধান্ত অনুসারে এর নাম হলো 'বিধাননগর' বাস্তবধর্মী মহান পুরুষ বিধান রায়ের স্মৃতি রক্ষার্থে। লবণ হ্রদের বর্তমান অধিবাসীরা একটু ইংরাজী উচ্চারণের ভঙ্গিতে এটাকে বলে 'সল্টলেক সিটি'—'সিটি' শব্দটার ওপর অজানিতভাবে একটু জোর দিয়ে। বিদেশ থেকে ফেরবার সময় এক আমেরিকান বন্ধু যখন ঠিকানা চাইলেন—তখন আমিও একটু অহঙ্কার মিশ্রিত স্বরে বল্লাম 'সল্টলেক সিটি'। বন্ধুটি একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন **Is it in India or in States** 'এটা কি ভারতবর্ষে না স্টেট্সে অর্থাৎ আমেরিকায়?' বন্ধুটির বাড়ী হলো **Arizona**-তে—**Salt Lake City**'র কাছে। পরে মানচিত্র থেকে

উদ্ধার করলাম যে আমাদের এই Salt Lake City থেকে যদি পাতাল পথে সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে চলতে থাকি তবে আমাদের কপিল মুনির আশ্রম পেরিয়ে গ্রীকদেবতা প্লুটোর প্রাসাদটা পাশ কাটিয়ে সোজা সুড়ঙ্গ পথে ফিতে মেপে আট হাজার মাইল চলে গেলে পৌঁছে যাবো আর একটা সল্টলেক সিটিতে, উটার রাজধানী আমেরিকার একটি রাজ্যে। আমেরিকার সল্টলেকের একপাশে সল্টলেক মরুভূমি। আমাদের সল্টলেকও অবশ্য গঙ্গার বালিমাটি দিয়ে ভরাট করে প্রায় মরুভূমির মতোই করা হয়েছিল, যে জন্য এখনও একে অনেকে 'বালুর মাঠ' বলে, তবে আমাদের Salt Lake এর থেকে Salt চালান হয় না। আর Utah র Salt Lake থেকে Salt তৈরী হয় দেশের জন্য।

আমাদের লবণহ্রদের ইতিবৃত্ত ব্যাখ্যান করতে গেলে একথা স্বীকার করে নিতে হবে যে বর্তমান এই বিশাল আবাসভূমি সুন্দরবনেরই এক অংশ, সুন্দরবন পরগনার অন্তর্গত এবং সুন্দরবনেরই বিস্তৃতি। এটা ধরে নিলে বলা যায় যে রঘুবংশে উল্লিখিত আছে, এই লবণহ্রদেরই আশে পাশে কোন এক জায়গায় দ্বিগ্বিজয়ের যাত্রাপথে "বুঢ়ারস্কো বৃষস্কন্ধ শাল-প্রাংশু"—মহাভুজঃ রঘু বিজিত সুহ্মদের নিয়ে বঙ্গদের সঙ্গে এক তুমুল লড়াই করেছিলেন—বঙ্গরা এসেছিল বড় বড় নৌকায় পাল তুলে ঢাল সড়কী আর বর্শা নিয়ে আর সুহ্মরা ছিল সুসজ্জিত হাতীর হাওদায় আরোহী। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে বঙ্গ বলতে পূর্ববঙ্গের লোকদের বুঝায়, আর সুহ্মরা হলো পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী। অবশ্য রঘুবংশে সুহ্মদের ধরা হয়েছে আরাকান এবং ত্রিপুরার অধিবাসীরূপে কিন্তু আবুল ফজল মহম্মদ আব্দুল জলীলের লিখিত 'সুন্দরবনের ইতিহাস' গ্রন্থে সুহ্মদের পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী বলে বর্ণিত করা হয়েছে। যদি আমরা এইগুলিকে মেনে নিই তবে রঘুবংশে উল্লিখিত লড়াইকে দুই বাংলার লড়াই বলে ধরা যায়। চোখ দুটোকে একবার বন্ধ করে কল্পনার হাওয়া গাড়ীতে চলে যান একেবারে সেই 'রঘুপতি রাঘব রাজারাম' এর পূর্বপুরুষ রঘুর সমকালীন যুগে।

লবণ হ্রদের ইতিকথা

ভারতের কোন অংশের নাম সূক্ষ্ম সেটা ঠিক করতে হলে প্রাচীন পুরাবৃত্ত দেখতে হয়। মহাভারতে লিখিত আছে যে উশীনড়ের ভ্রাতা তিতিক্ষুর কুলোদ্ভব বলির ভার্য্যার গর্ভে ও দীর্ঘতমার ঔরসে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সূক্ষ্ম ও পুণ্ড্র নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। তাদের মধ্যে যিনি যে দেশে রাজত্ব করতেন, তাঁর নামানুসারে পরিচিত হয়েছিলো সে দেশ। সেই হিসাবে যেহেতু সূক্ষ্মের অধীনে ছিল ত্রিপুরা ও আরাকান প্রদেশ, সেইজন্য ত্রিপুরা ও আরাকানের অধিবাসীদেরও বলা হয় সূক্ষ্ম। এখানে সূক্ষ্মদের পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। রঘু পরাজিত সূক্ষ্মদের নিয়ে তালীবন শ্যামল সাগর উপকূল দিয়ে সুন্দরবন এলাকায় উপস্থিত হলেন। সেখানে অপেক্ষা করছিল বঙ্গদেশস্থ রাজগণ নৌকায়, তাদের অস্ত্রশস্ত্র ছিল ঢাল, সড়কী, বর্শা ইত্যাদি কিন্তু সিংহবিক্রম রঘুর সৈন্যদের সঙ্গে মিলিত সূক্ষ্মরা বঙ্গদের সম্পূর্ণভাবে পরাজিত ও বিধ্বস্ত করেছিলেন। পরাজিত বঙ্গ একেবারে সেই পদ্মাপারে গিয়ে আত্মরক্ষা করে এবং তারপর বহুযুগ ধরে আর পশ্চিমমুখো হবার সাহস হয়নি। মজার কথা যে মুসলমানের হাতে মার খেয়ে ১৯৭১ সালে আবার পশ্চিমবঙ্গে বাস্তুহারা হয়ে তাদের আসতে হয়েছে আর থাকতে হয়েছে এই লবণহ্রদেরই এক অংশে। বলির ভার্য্যার গর্ভে ও দীর্ঘতমার ঔরসজাত এই বঙ্গসন্তান এক অভিশপ্ত সম্প্রদায়—এরা বাংলা দেশে মার খায় হিন্দু বলে, আসামে মার খায় বাঙ্গালী বলে, আর বিদেশে মার খায় ভারতীয় বলে।

আমাদের লবণহ্রদের প্রতিটি ধুলিকণা কত যে পবিত্র সেটা জানা যায়, লবণহ্রদের পলিমাটির উৎস সন্ধান করে। গঙ্গোত্রী হিন্দুদের এক পবিত্র তীর্থক্ষেত্র—হিমালয়ের শিখরে অবস্থিত এই গঙ্গোত্রীতেই গঙ্গার উৎসস্থল।

গঙ্গা শত শত নির্ঝরিণী পথে চির তুষার মণ্ডিত হিমালয় হতে নিঃসৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গরাশিরূপে ক্ষ্যাপা পাগলের মতো ছুটে সমুদ্রের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে—সঙ্গে করে নিয়ে আসে অপরিমিত পর্বতরেণু

হিমালয়ের পাদদেশ থেকে—সমুদ্রের তলদেশে স্তরের পরে স্তর জমতে থাকে এবং সেই পবিত্র গঙ্গার স্পর্শ-ধন্য সমুদ্র তরঙ্গ শীর্ষে নৃত্যরতা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পলিমাটির কণিকাগুলি মাটিতে আছড়ে পড়ে যুগ যুগ ধরে কালের অলক্ষিতে সৃষ্টি করেছে সমুদ্র কূলবর্ত্তী এই বিস্তীর্ণ সুন্দরবন। পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গা ব্রহ্মাকমণ্ডলু 'উচ্ছলি' ধুর্জটির জটিল জটাজাল ছিন্ন করে অসংখ্য পলিমাটি রাশি দ্বারা সৃষ্টি করেছে সুন্দরবন, আর আমাদের লবণহ্রদ সৃষ্টি হয়েছে সেই গঙ্গাগর্ভের পলিমাটির দ্বারা। নদীমাতৃক এই বাংলা দেশ—সুন্দরবনের বুক চিরে স্রোতস্বিনীর দল সব ছুটে এসেছে জনসমুদ্র কলকাতার দিকে। এইসব স্রোতস্বিনীর মধ্যে সুন্দরী বিদ্যাধরী বনসভাতলে চিরযৌবনা নৃত্যরতা উর্ব্বশীর মতো সুন্দরবনের সংলগ্ন এই বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ডকে বিমোহিত করে রেখেছে। গঙ্গার উৎক্ষিপ্ত জলরাশি সমুদ্রগর্ভে পতিত হয়ে লবণাক্ত হলো—আর সেই লবণাক্ত জলরাশি সুন্দরবনের বুক চিরে তরঙ্গরাশির ঘাত প্রতি-ঘাতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আবর্তের মধ্য দিয়ে রূপায়িত হলো লবণহ্রদের অসংখ্য ভেড়িতে। পূত পবিত্র গঙ্গার ধূলিকণার স্পর্শে লবণহ্রদ জেগে উঠলো এক নতুন কলকাতার রূপ পরিগ্রহ করে।

ভগীরথ এনেছিলেন গঙ্গাকে আবাহন করে, শঙ্খ বাজিয়ে পৃথিবীর অগণিত পাপীর বুকে আশার সঞ্চার করে—শত শত নরনারী ধন্য হলো গঙ্গার সলিলে অবগাহন করে, নগরনগরী ধন্য হলো গঙ্গার পুণ্যধারার স্পর্শে—আর দূরদর্শী বিধান রায় নিয়ে এলেন লবণহ্রদে গঙ্গার মাটি আর জল—লবণহ্রদ সেই পুণ্যমুহূর্তে মঙ্গল-শঙ্খধ্বনির মধ্যে জেগে উঠেছিলো শত শত গৃহহীন মধ্যবিত্ত পরিবারের বুকে একটুখানি আশা। হয়তো বাঁধা যাবে ছোট একটুখানি বাসা শহর লবণহ্রদের বুকে।

ছোট্ট একটুখানি বাসা বাঁধবার আশা মধ্যবিত্ত মানুষের চিরদিনের স্বপ্ন। ভেবেছে শ্রান্ত ক্লান্ত দিনাবসানে নিজের সর্বস্বের বিনিময়ে গড়া ছোট প্রাঙ্গণের পত্র-পুষ্প শোভিত পরিবেশ হয়তো ভরে উঠবে শান্তিতে আনন্দে উচ্ছলে।

লবণ হ্রদের ইতিকথা

হিমালয় গাত্র বিধৌত পবিত্র ধূলিকণা পুণ্যসলিলা তরঙ্গায়িত গঙ্গার দ্বারা প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে উৎক্ষিপ্ত হলো—সেই পবিত্র জলরাশি। তারই বিস্তৃতি আমাদের এই লবণহ্রদ। অপার লবণাম্বুরাশি অজস্র নদীর মাধ্যমে তরঙ্গায়িত হয়ে শত শত বৎসর অবিরত প্রবল ঘাত সংঘাতে তৈরী করলো লবণহ্রদের ভেড়ি,, এই ভেড়িকে কেন্দ্র করে মৎস্যজীবিদের দিবারাত্র পরিশ্রমে লবণহ্রদের আশেপাশে গজিয়ে উঠলো নতুন এক ধনী সম্প্রদায়। বিধানচন্দ্র মনশ্চক্ষে দেখতে পেলেন যে এই ভেড়ি-গুলোকে দখল করে এগুলো ভরাট করে নিলে যে বিস্তীর্ণ এলাকা হবে, সেখানে এক নতুন কলকাতার প্রবর্তন করা যাবে। তাই তিনি ভেড়ি ভরাট করার জন্য একটি যুগোশ্লাভ কোম্পানীর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হলেন।

গঙ্গার বুকে হঠাৎ একদিন দেখা গেলো এক বিরাট নৌবহর—সবশুদ্ধ ১১ খানা জাহাজ, ২টি ড্রেজার, ২টি পুস ট্যাগ—তারা ছড়িয়ে পড়লো গঙ্গার বুকে। গঙ্গার যে অংশ শ্রীশ্রী ঠাকুরের স্মৃতি বিজড়িত এবং স্বামীজীর সান্নিধ্যধন্য সেই অংশ অর্থাৎ হাওড়া পুল থেকে বিবেকানন্দ পুল পর্যন্ত যে বিস্তীর্ণ অংশ তারই তলদেশ থেকে ড্রেজারের দ্বারা গঙ্গার পলি ও মৃত্তিকারাশি অনর্গল আহরণ করে ফেলা হতো বার্জের মধ্যে এবং সেখান থেকে ভাসমান পাম্প যন্ত্রদ্বারা বাগ-বাজারের লকগেটের নিকট চালান করা হতো এবং সেখান থেকে লবণহ্রদের ভেড়ির মধ্যে। এই পলিমাটির স্রোত যখনই উত্তেজনার অভাবে হাঁফিয়ে উঠতো, তখনই আবার তাকে উদ্দীপনা যোগানো হতো পথিমধ্যে স্থাপিত বুষ্টার পাম্প যন্ত্র দ্বারা। পরিসংখ্যানবিদেরা বৈজ্ঞানিকদের সাহায্যে গঙ্গাবক্ষোদ্ভূত পলিমাটির বিশাল স্রোত হিসাব করে জানিয়েছেন, পরিমাণ ৮৩,০০০,০০০ Cubic ft.—ভরাট জমির পরিমাণ ৩·৭৫ Sq. mile এবং খরচ ৩৮ কোটি টাকা। Reclamation কাজের ভার দেওয়া হলো Iran Multivonic Company (Invest-Import) কে। কোম্পানীর নাম Iran এর নাম। ভুল করবেন না, এ Iran কিন্তু আমাদের আতাউল্লা খোমেনির Iran নয়—ইনি হলেন

যুগোশ্লাভের মুক্তিযুদ্ধের এক মহান বীর পুরুষ। তারই পুণ্য স্মৃতি রক্ষার্থে কোম্পানীর নাম হয়েছিল Iran Multivonic এবং এর সুযোগ্য প্রধান ইঞ্জিনীয়র হলেন M. Spiric। তাঁরই সুপরিচালনায় লবণহ্রদের ৩·৭৫ Sq. mile জমি তৈরী হলো চুক্তিপত্রে নির্দ্ধারিত সময়ের অনেক আগে।

কলকাতা তথা ভারতের তথা উন্নতিশীল দেশের শহরগুলির প্রধান সমস্যা হলো অবিরত জনসংখ্যা বৃদ্ধি। প্রতি সেকেণ্ডে দুটি করে মানবশিশু জন্ম নিচ্ছে, আর যমরাজের শত সদিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি তাদের মধ্যে একটির বেশী ছিনিয়ে নিতে পারছেন না। ফলে দাঁড়াচ্ছে বিশাল জনস্রোত। এই জনস্রোত রোখবার জন্য চলেছে নানা রকম Planning—কিন্তু কোন Planning-ই রুখতে পারছে না এই স্রোতকে। এইসব Family Planning-এর বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছে এক-দিকে ধর্মান্ধতা—আরেকদিকে হয়ত আছে হিজড়েদের ভগবানের দরবারে প্রতিনিয়ত প্রার্থনার প্রতিফল।

যুগোশ্লাভ কোম্পানীকে লবণহ্রদের ভেড়ি ভরাট করে নয়া কল-কাতার পত্তন করবার চুক্তি দেওয়া হলো—কারণ এই কোম্পানী তাদের নিজেদের দেশে অনুরূপ একটি নতুন শহর সৃষ্টি করেছিল সেখানকার এক বিরাট জলাশয় ভরাট করে—সেখানেও নদীর তলদেশ থেকে ড্রেজারের সাহায্যে মাটি তুলে তৈরী হয়েছিল এক নতুন শহর—যার ওপর গড়ে উঠেছে আকাশচুম্বী Multi-Storied সব Flat। পশ্চিম বাংলা থেকে ইঞ্জিনীয়ারদের একদল পাঠানো হলো সরেজমিনে তদন্ত করে দেখতে যে নদীর পলিমাটি দিয়ে ভরাট করা জলাশয়ের ওপর Multi-Storied Building দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে কিনা। মাঝে খুব গুজব উঠেছিলো যে সল্টলেকের বালিমাটির ওপর বাড়ী করলে সেটা যে কোন সময় ধ্বসে মাটির তলায় কবরস্থ হতে পারে। অবশ্য অনেকে বলে যে কলকাতার যারা জমিদার, যাদের একমাত্র কাজ পিতৃপুরুষের রেখে যাওয়া জমি এবং বাড়ী বিক্রী করে বিলাসিতায়

আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে দিন কাটানো, তারা সল্টলেককে মোটেই ভালো চোখে দেখতে পারে নি কারণ তারা ভেবেছিল যে নয়া কলকাতা একবার যদি মাথা তুলে দাঁড়ায় তবে জব চার্ণকের কলকাতার জমির দাম কমে যাবে এবং জমি কেনা বেচা ব্যবসায় ফাটল ধরবে।

মার্শাল টিটো এলেন নিউদিল্লীতে—চলেছেন লালকেল্লায় সম্বর্ধনা সভায়, সঙ্গে রয়েছেন বন্ধুবর জহরলাল নেহেরু। পথে ভীড়ের মধ্যে একটি ছেলে সাহস করে এগিয়ে গেছে টিটোর কাছে। তাঁর হাতের ক্যামেরার দিকে সতৃষ্ণনয়নে তাকিয়ে ছিল ছেলেটি—ছোট ছেলেটির মনের কথা বুঝতে পেরে মার্শাল টিটো তার হাতে তুলে দিলেন ক্যামেরাটা—ছেলেটি আনন্দে আত্মহারা। ঘটনাটি হয়তো একেবারেই সাধারণ, কিন্তু এরই মধ্যে ফুটে উঠেছে যুগোশ্লাভের সর্বময় কর্তার উদার মনোভাবের, যেন তিনি বন্ধুত্বতার হাত বাড়িয়ে দিলেন ভারতীয় ভবিষ্যৎ বংশধরের দিকে।

Non-Aligned Conference এর প্রধান চারটি হোতা—নেহেরু, টিটো, হাইলে-সেলাসী ও নাসের। নেহেরুর সঙ্গে টিটোর ছিল এক অকৃত্রিম বন্ধুত্ব—সেই সূত্রে দুই দেশের জনগণের মধ্যেও এক সদ্ভাব ও বন্ধুত্বের আবহাওয়া দেখতে পাওয়া যাবে। এই প্রসঙ্গে আমার একটা ঘটনা মনে পড়ে গেলো, হয়তো উল্লেখযোগ্য হতেও পারে।

আমি তখন ইথিওপিয়ার রাজধানী আদ্দিস আবাবায়। সেদিন ছিল Christmas eve। নিমন্ত্রণ ছিলো এক যুগোশ্লাভ ডাক্তার বন্ধুব বাড়ীতে—নৈশ ভোজের পার্টিতে। বুফে ডিনারের আয়োজন হয়েছে। প্রশস্ত সুসজ্জিত হল ঘরে Ball dance চলছে—সে কি উদ্দাম নৃত্য: বিজলি বাতি সব নিভিয়ে দিয়ে ব্যবস্থা রয়েছে মোমবাতির স্তিমিত আলোর। এর সুবিধা হচ্ছে একদিকে মোমবাতির ক্ষীণ বর্তিকার অপরূপ শান্ত সমাহিত পরিবেশ সৃষ্টি, অন্যদিকে রাতের আবছা অন্ধকারে দৈহিক অঙ্গ-ভঙ্গীর নিঃসঙ্কোচ নৃত্যলীলা। নাচের মাঝে মাঝে অবসর—সেই সময় পানীয় এবং হালকা খাদ্যসামগ্রীর সাহায্যে চলেছে পরিশ্রান্ত

দেহের ক্লান্তি দূর করা। এরই ফাঁকে ফাঁকে বিশ্রম্ভালাপন, আমি ঘরের এককোণে বসে আমারই মতো আর এক নিরামিষ বন্ধুর সঙ্গে কথা বলছি। সেই সময় হঠাৎ সেখানে হাজির সদ্য পরিচিত যুগোশ্লাভ বন্ধু—আমার দিকে হাত বাড়িয়ে করমর্দন করে অভিনন্দন জানালেন আমাকে। যখন তার দিকে তাকিয়ে আছি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে—তিনি বললেন তোমাদের অভিনন্দন জানাই যে তোমরা মাত্র ১৩ দিনে সমস্ত পূর্ব পাকিস্তান দখল করে নিয়েছো, মনে পড়ে গেলো পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধের কথা—আমাদের বিজয়বার্তা ছড়িয়ে পড়েছে দেশে দেশে—ভারতের এই দরদী বন্ধু তাই সেই সুযোগে এক ভারতীয়ের মাধ্যমে হার্দিক অভিনন্দন জানালেন। ভারত এবং যুগোশ্লাভের এই মিত্রতাসুলভ সম্পর্কের জন্যই যুগোশ্লাভ কোম্পানীকেই বেছে নিয়েছিলেন বিধান রায়। যুগোশ্লাভের মুক্তি যোদ্ধা ইরাণের স্মৃতিবিজড়িত এই কোম্পানী চুক্তিবদ্ধ সময়ের অনেক আগেই কাজ শেষ করে ভারত যুগোশ্লাভ মৈত্রীর সম্মান অক্ষুন্ন রেখেছিলেন।

বাস্তববাদী দূরদর্শী বিধান রায় কলিকাতার ক্রমবর্ধমান জনসমুদ্রের কথা চিন্তা করে এটা সম্যক উপলদ্ধি করেছিলেন যে এই মহানগরীর প্রবল জনস্রোতকে সুসংযতভাবে প্রবাহের সুযোগ না দিলে একদিন না একদিন এক বিরাট বিধ্বংসী জনবন্যার প্লাবনে সমস্ত মহানগরী ধ্বংস হয়ে যাবে।

তাই তিনি যুগোশ্লাভের Iran Multivonic কোম্পানীর সঙ্গে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করলেন, শহর লবণহ্রদ সৃষ্টির জন্য ভেড়ি ভরাটের।

* * *

রঘুপতি রাঘব রাজা রামের পূর্বপুরুষ মহান রাজা রঘু প্রাগৈতিহাসিক যুগে তাঁর দিগ্বিজয়ের পথে এই লবণ হ্রদেরই কাছাকাছি এসেছিলেন। আর ঐতিহাসিক যুগে এসেছিলেন আমাদের লবণহ্রদে স্বাধীন বাংলার শেষ নবাব মনসুর-সোলক-সিরাজদ্দৌল্লা শাহকুলি খাঁ মীরজা মহম্মদ হায়রৎজঙ্গ বাহাদুর। লবণ হ্রদের আশেপাশে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে তাঁর

তাঁবু পড়লো—সঙ্গে ছিলো পঞ্চাশ হাজার পদাতিক আর চোদ্দ হাজার অশ্বারোহী। এই লবণহ্রদ থেকেই তিনি যুদ্ধযাত্রা করলেন ইংরেজের বিরুদ্ধে। জুন মাসের মাঝামাঝি—বর্ষাকাল—কলকাতার ইংরেজ বাসিন্দাদের মনে আতঙ্ক জাগিয়ে খবর ছড়িয়ে পড়লো যে নবাব বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে আসছেন ইংরাজদের সমুচিত শিক্ষা দিতে। চারিদিকে সাজ সাজ রব, বিবিমহলে কান্নার রোল, ব্যবসায়ীরা তল্পিতল্পা সামলাতে ব্যস্ত। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাউন্সিলের মিটিং বসলো। খবর পাঠানো হলো মাদ্রাজে সৈন্য সরবরাহের জন্য। ইংরেজরা পরামর্শ করতে লাগলো কি করে নবাবের সৈন্য অন্ততঃ মাসখানেক আটকে রাখা যায়। একবার মাদ্রাজ থেকে ইংরেজ সৈন্যবাহিনী যদি এসে পড়ে তবে চিন্তা থাকে না। নবাবকে উচিত শিক্ষা দেওয়া যাবে।

প্রথমে সিরাজের সৈন্য হুগলীর কাছে গঙ্গা পার হয়ে বরানগরে এসে উপস্থিত হল। আতঙ্কে ইংরেজরা তাদের বিবি-বাচ্চাদের পাঠিয়ে দিল ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের মাঝে—সেখানে সাদা চামড়ার কলকাকলিতে সমস্ত দুর্গ সরব হয়ে উঠলো।

মীরজাফরের অধীনে সৈন্যবাহিনী খুব চেষ্টা চালালো চিৎপুরের কাছে সাঁকোর সাহায্যে খাল পার হয়ে কলকাতায় পৌঁছতে—কিন্তু সাঁকোটা এত ছোট যে তার ওপর দিয়ে ঐ বিরাট বাহিনী নিয়ে পার হওয়া একরকম অসম্ভব। নবাব যখন ঐ সমস্যা নিয়ে বিব্রত—ইংরেজরা সুযোগ বুঝে পিকার্ড সাহেবের নেতৃত্বে পেরিন্ পয়েন্ট থেকে গোলাবর্ষণ করতে থাকলো নবাব সৈন্যের ওপর। মীরজাফর উপায় না দেখে সৈন্য নিয়ে দমদমের দিকে পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করলো। প্রথম ধাক্কায় নবাবের সৈন্যকে হঠতে হলো—ইংরেজের জয়োল্লাসে ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গপ্রাকার প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠলো। নবাবের নিকট প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো কি করে কলকাতায় ঢোকা যায়—এই পটভূমিকায় এসে হাজির হলো উমিচাঁদের জমাদার জগন্নাথ সিং। এখানে জগন্নাথ সিংএর একটু পরিচয় দেওয়া দরকার। কলকাতার তদানীন্তন গভর্নর

ড্রেক সাহেবের কাছে খবর পৌঁছালো যে উমিচাঁদ নবাবের পক্ষে—গুপ্ত যোগাযোগ আছে নবাবের সঙ্গে। ড্রেক হুকুম দিল উমিচাঁদের বাড়ী ঘেরাও করবার। সিপাহীদের সঙ্গে দলে দলে ফিরিঙ্গিরাও এসে উপস্থিত হলো ধন দৌলত লুণ্ঠনের লোভে। প্রভুভক্ত জগন্নাথ সিং স্বয়ং রাজপুত —ফিরিঙ্গিরা যখন চেষ্টা করছিলো অন্তঃপুরে প্রবেশ করবার, তখনই লেগে গেলো তুমুল লড়াই। কিন্তু ফিরিঙ্গিরা ছিল সংখ্যায় অনেক বেশী —জগন্নাথের অধীনে বরকন্দাজ হারবার মুখে। জগন্নাথের ধমণীতে রাজপুত রক্ত জেগে উঠলো—ফিরিঙ্গিদের হাতে লাঞ্ছনার ভয়ে অন্তঃপুর বাসিনীদের সব একত্র করে নিজের হাতে একে একে তাদের হত্যা করল, সর্বশেষে সতীরক্ত আপ্লুত ছোরা নিজের বুকে বসিয়ে দিল। কিন্তু ইতিহাস অপেক্ষা করছিল জগন্নাথের অবদানের জন্য তাই আত্মহত্যার চেষ্টা তার বিফল হলো। দেখা দিল জগন্নাথ ইতিহাসের আর এক অধ্যায়ে —সিরাজের সৈন্যের পথ প্রদর্শক হিসাবে। সে সন্ধান দিল কলকাতায় ঢোকার দুটো পথ—একটা টালার কাছ দিয়ে আর একটা শিয়ালদহের কাছে। নবাব বেছে নিলেন শিয়ালদহের কাছে যে সাঁকোটা সেইটা, তার ওপর দিয়ে নবাবের সৈন্য এগিয়ে চল্লো কলকাতার দিকে। এই-সময় অর্থাৎ ১৬ই জুন নবাব তাঁবু ফেললেন লবণহ্রদের সীমানার মধ্যে জলাভূমির আশেপাশে।

১৭ই জুন, ১৭৫৬ সাল, লবণহ্রদের তাঁবু থেকেই নবাব সৈন্য যাত্রা করলো ইংরেজকে সমুচিত শিক্ষা দিতে।

নবাব সিরাজদ্দৌল্লার জীবনের শেষ জয়োল্লাস ফেটে পড়লো লবণ-হ্রদের তাঁবুতে তাঁবুতে। লবণহ্রদের আকাশ বাতাস সিরাজের জয়ধ্বনিতে ভরে উঠলো। তাঁবুর অভ্যন্তর হলো উল্লসিত, খুশমেজাজী নর্তকীদের নৃত্যের তালে তালে আর নূপুর-নিক্কনে।

ইতিহাসের পাতা থেকে আবার ফিরে আসা যাক বর্তমানের গণ্ডীতে। ভেড়ির ইজারা পেলো সরকারেরা, নস্করেরা এবং প্রামাণিক বংশ। নানা-রকমের মাছের চাষ চলতে লাগলো। ভেড়িগুলো পাহারা দেবার জন্যে

একদল লোক জলের ধারে 'আলা' বেঁধে আড্ডা জমিয়ে নিল। অফুরন্ত অবসরের সুযোগ নিয়ে এবং লোক চলাচলের অভাবে অলস মস্তিষ্কে শয়তানের আবির্ভাব হলো, এবং সেই সঙ্গে দেখা দিল গঞ্জিকাসেবীদের আখড়া, চোলাই মদ তৈরী আর চোলাই মদের চালান। মাছের ব্যবসায়ের ফাঁকে ফাঁকে ক্রমশই এঁদের আনাগোনার ভীড় জমে উঠলো। এরই সুযোগ নিয়ে হাজির হলো সাধুবাবারা—পরিণত হলো গেরুয়াবসন পরিহিত পূজারীতে। অভাব হলো না অশিক্ষিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভক্তদের। কেষ্টপুরের খালের পার ঘেসে আস্তে আস্তে দেখা দিল মন্দির—ইট আর মাটি সংযোগে গাঁথনী তৈরী হলো, টিন দিয়ে হলো ছাদ আর মন্দিরের বিগ্রহরূপে দেখা দিল তেল-কুচকুচে প্রস্তরখণ্ড শিবঠাকুরের প্রতিমূর্তি। চৈত্র সংক্রান্তিতে গাজনের মেলা শুরু হলো—আর ঐ মেলাকে কেন্দ্র করে লোকের ভীড়। লোকেদের প্রলুব্ধ করবার নানা প্রকার পণ্যসামগ্রী এবং নিশিকুটুম্বেরও অভাব হলো না। ভক্তজনের আনাগোনায় যেমনই মন্দিরের সৌষ্ঠব ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে লাগলো, তেমনই চলতে লাগলো গঞ্জিকাসেবীদের নেশার মহড়া। লবণহ্রদ শহর পত্তনে দেখা দিল সমস্যা, সরকারী মহলেও লবণহ্রদের জমি থেকে মন্দির উচ্ছেদ নিয়ে দেখা দিল সমস্যা। ভেড়ির জল নিঃশেষ করে মৎস্যবংশ নির্মূল হয়েছে—গঙ্গার মাটি দিয়ে তাকে শোধন করে বসতি স্থাপনের ব্যবস্থাও পাকাপোক্ত করা হয়েছে। এখন মন্দির দেখা দিল এক বিরাট জটিল সমস্যারূপে! মন্দিরের শিবঠাকুর ততদিনে অগণিত ভক্তের ব্যোমধ্বনিতে আর গঞ্জিকার প্রগাঢ় ধূম্রজালে জড়িত হয়ে মাটিতে বেশ গেড়ে বসেছেন।

শ্রীজিতেন চক্রবর্ত্তী ছিলেন তখন সেচবিভাগের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী। তাঁর ওপর ভার পড়লো মন্দিরটা অপসারণের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করবার। তাঁরা একদিন খাতাপত্র বগলে হাজির হলেন; সাধুবাবার রক্তচক্ষু তখনও অর্দ্ধনিমীলিত আগের রাত্রের রঙীন পানীয় ও গঞ্জিকা-সেবনের প্রভাবে। সরকারী উদ্দেশ্য মন্দির অপসারণের সমস্যা সমাধান

করা। তাঁরা সবিনয় অনুরোধ রাখলেন, 'টাকা নাও, জমি নাও, তোমার মন্দিরটি এখান থেকে তুলে নিয়ে যাও অন্যত্র'। শিবঠাকুরের পূজারী পোল্লে ঠাকুর টাকা নিলেন, জমি নিলেন। শিবঠাকুরটিকে বগলদাবা করে, রাঙা চোখ অশ্রুসিক্ত করে ছোটখাটো একটা বক্তৃতা উপস্থিত ভক্তদের উদ্দেশ্যে দিয়ে চলে গেলেন; সল্টলেক অথরিটি ভাবলেন বিদায় হলো আপদ। সমবেত ভক্তরা অভিশাপ দিল সরকারকে তাদের ধর্ম বিগর্হিত কাজের জন্য।

কর্তৃপক্ষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে যখন ভাবছেন যে সব মিটে গেলো বিধাতা তখন অলক্ষ্যে মুচকি হেসেছিলেন। পোল্লেমশাই তখন প্ল্যান আঁটছিলেন ফিরে আসবার জন্যে। পরের দিন ভোর হতে না হতেই পোল্লেমশাই সশরীরে এসে উপস্থিত শিবঠাকুরকে নিয়ে। ভক্তজনও ছুটে গেলো আশে পাশে। শিবঠাকুর স্বপ্নে আদেশ করেছেন যে বাস্তুহারাদের মতো এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াতে তিনি নারাজ—লবণ-হ্রদই তাঁর আসল বাসস্থান, ভক্তদের পীঠস্থান। সুতরাং তিনি তাঁর জাগ্রত ঠাকুরটিকে নিয়ে মন্দিরের মধ্যে জেঁকে বসলেন। ঘোষণা করলেন, 'সরকারের এ জুলুম চলবে না, তাদের পূজা যে রকম চলছিলো, সেই রকমই চলবে'। জয়ধ্বনি পড়ে গেলো চারদিকে। সল্টলেক অথরিটি প্রমাদ গুনলেন—কি করা যায়! পোল্লে আর তাঁর শিব-ঠাকুরটিকে কি করে বিদায় করা যায়। লালবাজার থেকে সিপাহী দল এলো একটা কিছু বিহিত করতে—কিন্তু পোল্লের বক্তৃতা শুনে কারও সাহস হলো না জাগ্রত শিবঠাকুরের গায়ে হাত দেবার। পোল্লের মন্দিরে চললো আগের মতোই গঞ্জিকা সেবন, পানীয়ের বহর, ভক্তদের উল্লাস। এদিকে সরকার বিব্রত হয়ে পড়েছেন। মিটিং এর পর মিটিং বসতে লাগলো। ফাইল বগলে কর্তারা ছোটাছুটি লাগিয়ে দিলেন। অনেক বাগবিতণ্ডার পরে তাঁরা সদলবলে হাজির হলেন পোল্লের দরবারে—আরোও বেশী টাকা, আরও বেশী অনুরোধ উপরোধ করে মস্তানদের ভয় দেখিয়ে তাদের পার করা হলো ধাপার পাম্পিং

স্টেশনের কাছে দশ কাঠা জমির ওপর আধুনিক স্থাপত্যের অনুকরণে মন্দির গড়ে দিয়ে। মন্দিরটি ছিলো এ-ই ব্লকের সীমানার মধ্যে কেষ্টপুর খালের পাশে। এখানে গাজনের মেলা বসতো—আশে-পাশের গ্রামের লোকেরা জমায়েত হতো। ভেড়ি মালিকেরাও মাঝে মাঝে দর্শন দিতেন। ভেড়িতে যারা কাজ করতো সেই জেলেজন, মেয়ে জন ও আলাজনের ছিল আনাগোনা।

ঘটনাটি শুনেছিলাম 'এবি' ব্লকের জিতেনবাবুর কাছে আর উপভোগ করেছিলাম ইরিগেশনের তদানীন্তন ডেপুটি-সেক্রেটারীর চেম্বারে বসে। এই ইতিবৃত্ত লিখতে বসে ভাবলাম দেখে আসি পোল্লে মশায়ের সল্ট-লেকের স্মৃতিবিজড়িত (!) নতুন মন্দির। ধাপার পাম্পিং ষ্টেশন কোথায় সমস্যা বাধলো তাই নিয়ে। আমাকে নির্দেশ দিলেন অনেকেই, কিন্তু সঠিক জায়গাটা খুঁজে পেতে বেশ বেগ পেতে হলো। মন্দিরের খোঁজে একদিন পৌঁছে গেলাম ট্যাংরার মসজিদে। আর একদিন পৌঁছে গেলাম শিয়ালদহের কাছে এক গীর্জায়। বেলেঘাটায় নেমে এক ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করতে গম্ভীর মুখে আদেশ দিলেন তাকে অনুসরণ করতে—আমিও সুবোধ বালকের মতো চল্লাম তাঁর পিছু পিছু। কিছু দূর গিয়ে তিনি দেখিয়ে দিলেন একটি রাস্তা। বল্লেন—সেটা দিয়ে গেলেই পেয়ে যাবো আমার অভীপ্সিত স্থান। আনন্দের সঙ্গে এগিয়ে পেলাম এক মন্দির—বারান্দায় বসে খৈনি টিপছে এক বিরাটাকায় মাংসপেশী ভোজপুরী হুকুম দিলো, জুতোজোড়া খুলে রাখতে। আদেশ মেনে নগ্নপদে এগিয়ে গিয়ে প্রণাম জানালাম ঠাকুরের উদ্দেশ্যে। আবার বাজখাঁয়ী গলায় হুকুম এলো, 'প্রণামী ফেলুন'—ট্যাঁক থেকে দশটা পয়সাও দিলাম তারপরে যখন জানতে চাইলাম পোল্লে মশায়ের খবর —লোকটা হতবাক, জানিয়ে দিল যে আমি ভুলপথে এসেছি। বুঝতে পারলাম, আমি চেয়েছিলাম পাম্পিং ষ্টেশন। পৌঁছে গেছি ডাম্পিং ষ্টেশনে—বিফল মনোরথ হয়ে বাড়ী ফিরলাম। তারপর আবার খোঁজ করতে করতে হাজির হলাম নস্করদের দরবারে। তাদের বাড়ীতে

সঠিক পথ জানতে পারলাম।—এবার পৌঁছে গেলাম পোল্লে মশায়ের বাড়ীতে। বাড়ীর সামনে মন্দির—দূর থেকে দেখতে বেশ আকর্ষণীয়—কিন্তু ভেতরে উঁকি মেরে দেখি—শিবের পাশে আরও নানারকম দেবদেবীর আবির্ভাব- পূজার কোন আয়োজন নেই। এক কোণে গামছা পরে দু একজন বেশ তে-পাত্তি খেলছে। আর একদিকে একটা মস্তান গোছের ছেলে অসম্বৃত অবস্থায় সিনেমার গান ভাজছে। মনটা দমে গেল। ভাবলাম, এতদিন ধরে এই মন্দিরের দর্শনার্থী হয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম।

বর্তমান পূজারী—অর্থাৎ বর্তমান মালিক হচ্ছেন রাজকুমার পোল্লে জানালেন যে তার পিতৃদেব মাধব পোল্লে শ্যামনগরের অধিবাসী—এক রাত্রে স্বপ্নাদেশ শুনে তিনি সল্টলেকে মন্দির স্থাপন করেছিলেন—তাদের পূজা অর্চনার বিশেষ কোন কারবার ছিল না। পিতৃদেব ভক্ত হিসাবেই শিবঠাকুরের পূজা করতেন।

জিজ্ঞেস করলাম—এখন পূজা করে কে ? উত্তর এল—আমি নিজেই করি। পাশে একটি ছেলে জানাল যে সেও মাঝে মাঝে মন্দিরের শিবঠাকুরের পূজা করে—দুজনের মধ্যে তর্ক লেগে গেল মন্ত্রোচ্চারণ নিয়ে। মনে পড়ে গেল শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্তের শিবু পণ্ডিত আর রাখাল পণ্ডিতের তর্কের কথা। আর বেশি ঘাঁটালাম না। ভারাক্রান্ত মন নিয়ে ফিরে আসছিলাম—ভাবছিলাম আমাদের দেশে দেবতাদের নিয়ে এই ছিনিমিনি খেলা কতদিন চলবে। পোল্লে মশায় শিবঠাকুরকে অবলম্বন করে মেরে দিলেন দশ হাজার টাকা। পেয়ে গেলেন দশ কাঠা জমি, সঙ্গে লাভ হল কংক্রিটের তৈরী একটি মন্দির। তার মধ্যে আড্ডা জমছে মস্তানদের—খেলা চলছে জুয়াড়ীদের। গ্রামের অর্ধ-শিক্ষিত বাসিন্দারা তারই কাছে জানাচ্ছে প্রাণের আকুতি, অন্তরের বাসনা। আর ভীড় করে যে সব দেব-দেবী বাস করছে ঐ কংক্রিটের আচ্ছাদনের নীচে তাঁরাও নির্বিকারে মেনে নিচ্ছে এই ছলনা—এই শোচনীয় বঞ্চনা। এই প্রসঙ্গে কাদাপাড়ার মন্দিরের কথাও মনে পড়ে

যায়—ডাম্পিং স্টেশনের পাশেই মন্দিরটি দূর থেকে দেখলে ভক্তি উছলে ওঠে, কিন্তু কাছাকাছি গেলে আপনি দেখতে পাবেন ভোজপুরী দারওয়ানের মত বিশাল গাট্টাগোট্টা চেহারা ঢুলুঢুলু আঁখি, বাজখাই গলা হুমকী দিয়ে কথা বলার ভঙ্গী—সব মিলিয়ে যেন এক বিষাক্ত পরিবেশের সৃষ্টি।

ডাম্পিং স্টেশনটা দেখে অনেক কথা মনে পড়ে গেল। কলকাতার বাল্যলীলা শেষ হয়েছে। এসেছে যৌবনের জোয়ার। জব চার্ণকের সুতানুটি হারিয়ে গেছে শহর কলকাতার মধ্যে। বিলীন হয়ে গেছে লোকের স্মৃতিপট থেকে জব চার্ণকের সান্নিধ্য—ধন্য সেই বটগাছটা যার বিস্তীর্ণ ছায়ার নীচে বসে জব চার্ণক গড়গড়া টানতেন আর ব্যবসা বাণিজ্যের দর কষাকষিতে মসগুল হয়ে পড়তেন। তখনও বণিকের মানদণ্ড দেখা দেয় নাই রাজদণ্ডরূপে। তখনও পলাশী প্রান্তরে লাখো লাখো পলাশ ফুল আপনার সৌন্দর্যে আপনি বিভোর হয়ে হিন্দুস্থানের স্বাধীন হাওয়ায় হিল্লোলিত হচ্ছে। জব চার্ণকের স্বপ্নকে সফল করে কলকাতা এগিয়ে চলেছে যৌবন জলতরঙ্গে ভাসতে ভাসতে। তারপর কালের ক্ষিপ্রগতিতে কলকাতা দেখা দিল পরাধীন ভারতের রাজধানী-রূপে; ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হল অবসান। নতুন শাসনের হল প্রবর্ত্তন—ইংরেজ বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল রাজদণ্ড রূপে। "বঙ্গ তারে আপনার গঙ্গোদকে অভিষিক্ত করি নিল চুপে চুপে" "মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় সিরাজের দেহাবসানে"।

লর্ড বেন্টিক তখন গদীতে আসীন—এক বিরাট সমস্যা দেখা দিল কলকাতার বিশাল আবর্জনার স্তূপ নিয়ে। আহিরীটোলার গঙ্গার পাড় দিয়ে যে রাস্তাটা উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে চলেছে—সেটা ক্রমে ক্রমে ভরে উঠেছে আবর্জনা স্তূপে। সাহেব মেমরা নাকে রুমাল দিয়েও হাঁটতে পারছেন না। মেম গিন্নীদের তাড়নায় সাহেব কর্ত্তারা মিটিংএ বসলেন ঘন ঘন। খোঁজ চলতে লাগল উপযুক্ত স্থানের যেখানে নির্বিঘ্নে কলকাতার জমা ঐ আবর্জনা পাহাড়কে নিক্ষেপ করা যায়।

তখনকার দিনে কলকাতার পূর্ব্ব সীমানা ছিল মারাঠা ডিচ্—অর্থাৎ বর্ত্তমান সার্কুলার রোড—এই খোঁজের ফলেই সাহেবদের নজরে পড়ল লবণ হ্রদ—ছাই ফেলতে চাই ভাঙ্গাকুলো। আর আহিরীটোলায় জমা আবর্জনা—কলকাতাবাসীদের বিশেষত সাহেব মেমের পরিত্যক্ত আবর্জনা ফেলতে আবিষ্কার হল লবণ হ্রদের। তারই মধ্যে বেছে নেওয়া হল এক মাইল লম্বা ও এক মাইল চওড়া একটা জায়গা—নাম হল স্কোয়ার মাইল। এটাকেই তারা কাজে লাগাল ডাম্পিং স্টেশনরূপে। কিন্তু আহিরীটোলার শহর প্রমাণ বিশাল জঞ্জাল ও উদ্ভিন্ন যৌবনা শহর কলকাতার পরিত্যক্ত পুরীষ কি করে চালান করা যায় ঐ লবণ হ্রদের স্কোয়ায় মাইলে অবস্থিত ডাম্পিং স্টেশনে—কর্ত্তাব্যক্তিরা পরামর্শে বসে গেলেন শেষে স্থির হল রেল গাড়ী বসানোর। পাতানো হল রেল লাইন, তৈরী হল সুন্দর ঝকঝকে বিরাট কৌটার মত দেখতে রেলের ডিব্বা। ওপরে ঢাকনা বসান হল। বাইরে থেকে মনে হয় যেন হীরা পান্না মণিমুক্তা নিয়ে চলেছে শহরের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে। কোট প্যান্ট পরিহিত ইঞ্জিন চালক বাঁশী বাজাতে বাজাতে পৌঁছে যেত লবণ হ্রদের ধাপায়। খতিয়ে দেখতে গেলে পুরীষ বা বিষ্ঠার সঙ্গে তুলনা করা যায় অমূল্য সম্পদের সঙ্গে। আপনারা হয়ত হাসছেন—কিম্বা নাক সিটকে ছ্যা ছ্যা করছেন—কারণ হচ্ছে যে আপনারা জানেন না যে বিষ্ঠার কি অপার মহিমা, যে শিশু নিজের বিষ্ঠা স্বহস্তে ভক্ষণ না করেছে সে শিশু কখনই পূর্ণাঙ্গ সুস্থ মানসিক জীবন যাপন করতে পারে না। এটা হল মনস্তত্ত্ব-বিদদের কথা। সুন্দরবনে যদি কখনও বাঘ শিকার করতে যান, আহত বাঘের সম্মুখীন যদি কখনও হন—তবে দেখতে পাবেন যে যন্ত্রণা কাতর সেই বাঘ অজস্র লালা আপনার শরীরে ঢেলে দিয়ে আপনাকে সহযাত্রী করার চেষ্টা করছে। বাঘের সেই লালা এতই বিষাক্ত যে তার সংস্পর্শে মৃত্যু অনিবার্য্য। শিকারী বন্ধু আপনি জেনে রাখুন এই নিদারুণ যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুর হাত থেকে যদি রক্ষা পেতে চান তবে একমাত্র পন্থা হল বিষ্ঠার

শরণাপন্ন হওয়া। শরীর থেকে লালা মুছে ফেলে খুব করে ঘষে ঘষে সারা গায়ে বিষ্ঠার প্রলেপ লাগিয়ে দিন। দেখবেন ধন্বন্তরীর কাজ করবে—আপনি আবার বেঁচে উঠবেন মৃত্যুর করাল কবল থেকে। তিব্বতে একবার ঘুরে আসুন দেখতে পাবেন এর কি কদর। দালাই লামার অনুচর লামাদের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতা লেগে যায় কে সর্ব্বাগ্রে দালাইয়ের পরিত্যক্ত টুকরোটি দখল করে নেবে—ভাগ্যবান ব্যক্তিটি অমূল্য সম্পদটি সংগ্রহ করে তাকে মন্ত্রপুতঃ করে কবিরাজী গুলিতে পরিণত করে রাস্তায় দোকান সাজিয়ে বসে। আপনি Gastric ulcer এ ভুগছেন—তুলসীপাতার রসের সঙ্গে একটা বড়ি গলাধঃকরণ করে নিন ; সব জ্বালা যন্ত্রণা সেরে যাবে। বহুদিনের পুরোন হাঁপানী—মধুর সঙ্গে একটা বড়ি গিলে ফেলুন দেখবেন সব হাঁপানী সেরে যাবে। আপনি যদি যুবক হন পাশের বাড়ীর মেয়েটিকে কিছুতেই বশ করতে পারছেন না—গোলাপের নির্য্যাস দিয়ে একটা ছোট্ট বড়ি খেয়ে নিন—দেখবেন পরের সন্ধ্যায়ই মেয়েটি আপনার আশে পাশে ঘুর ঘুর করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আপনার বার্দ্ধক্য এসেছে, গিন্নির বাক্য যন্ত্রণায় টিকতে পারছেন না—তুলসীপাতার রস অনুপান করে খেয়ে নিন। ব্যাস, পরের দিনই ভোরে দেখতে পাবেন যে আপনার গিন্নি আপনার পাদোদক নেবার জন্য আকুল হয়ে পড়েছেন। তাছাড়া শহর কলকাতার পরিত্যক্ত পুরীষের মহিমা তো সকলেই জানতে পারেন—যখন ধাপার ফুলকপি চড়া দামে কিনতে হয়।

শহর লবণ হ্রদের গোড়াপত্তন

লবণ হ্রদের সংলগ্ন ধাপার মাঠের উপর ১৮৬৫ সালে প্রথম নজর পড়ল ইংরাজ সরকারের। আর্মানীটোলা এবং আহিরীটোলা ঘাটের আবর্জনা স্তূপ ডাম্পিং করবার জন্য লবণ হ্রদের এক অংশ দখল করা হল এবং নাম হয়ে গেল স্কোয়ার মাইল। কলকাতার তদানীন্তন জাষ্টিস অফ্

পিস্ ১৮৬৫ সালে লবণ হ্রদের একাংশ দখল করে নিলেন। কলকাতার পয়ঃপ্রণালীবাহিত দূষিত জল নিষ্কাশনের উদ্দেশ্যে। শহরের ময়লা ফেলার জন্য এবং ঐ আবর্জনাকে সারে পরিণত করে চাষবাসের উন্নতির ব্যবস্থা করতে ইংরেজ সরকারের নথিপত্রে ঐ অংশের উল্লেখ করা হয়েছে 'স্কোয়ার মাইল' বলে।

১৮৬৫ সালে সল্টলেক রিক্লামেশন কোম্পানীর পত্তন হল ধাপার আবর্জনাস্তূপকে কাজে লাগানোর জন্য কোন লাভজনক কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে—কিন্তু কিছু দিনের মধ্যে ঐ স্কিম বাতিল হয়ে গেল। ১৮৭২ সালে লবণ হ্রদে ফিস্-ঘাটের স্থাপনা হল ঐ স্কোয়ার মাইল অঞ্চলে—একটা খাল কাটা হল লবণ হ্রদ থেকে মিউনিসিপাল বাজাব পর্য্যন্ত, নাম দেওয়া হল "রাজাখাল", ১৮৭৮ সালে ধাপা অঞ্চল নন্দলাল দাসের দখলে, আর ফিস ঘাট এবং মাছেব ভেড়িগুলোর মালিক ছিল দুর্গাচরণ কুণ্ডু। তাদের পাট্টার মেয়াদ শেষ হল ১৮৭৯ সালে। ইংরেজ সরকার তখন সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিল লবণ হ্রদের এই অংশ ইজারা দেবার উদ্দেশ্যে। বাবু ভবনাথ সেন পেলেন এই অংশের ইজারা ২০ বছরের জন্য। বাৎসরিক খাজনা ধার্য্য হল মাত্র ৩,৪০০৲। ১৮৮০ সালের ২৩শে জানুয়ারী সরকাবী পাট্টার তারিখ। দুর্গাচরণ কুণ্ডুর দলিলের মেয়াদ শেষ হল ১৮৮০, ৩০শে এপ্রিল এবং ঐ দিন থেকেই ধাপার সর্বময় কর্তৃত্ব ন্যস্ত হল ভবনাথ সেনের ওপর। ভবনাথ সেনের আমলে মাছের ভেড়ির মৎস্যচাষের অনেক উন্নতি সাধিত হয়েছিল। ১৮৯৯ সালে যখন ভবনাথ সেনের কর্তৃত্বেব মেয়াদ শেষ হল তখন ইংরেজ সরকার সমস্ত ধাপা অঞ্চলটিকে জরীপ করে বার্ষিক ৯,৭৫০ টাকা খাজনায় ১৯০৬ সালে আবার ১০ বছরের জন্য ইজারা দিল।

ধাপার মাঠের অনেক উন্নতি সাধন হল। উন্নতি সাধিত হল লবণ হ্রদের। সরকারের দৃষ্টি পড়ল সুন্দরবনের ওপর।

সুন্দরী নদী বিদ্যাধরীর জন্ম হল—বিরাট বিলে—সংযোগ ছিল সুন্দরবনের উপকূলে সমুদ্রের জোয়ার ভাঁটার খেলার সঙ্গে। সংযোগ

রয়েছে সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের সহিত। যৌবনের উচ্ছলতা নিয়ে ছুটে চলেছে লবণহ্রদের পাশ দিয়ে উত্তর পশ্চিম দিকে। হারুয়ার কাছে এসে এর পরিচয় হল হারুয়া গাং বলে। সেখান থেকে বেঁকে গিয়ে এর প্রবাহ মিশেছে নোনা খালের সঙ্গে—সেখান থেকে গিয়ে মিশেছে দক্ষিণ পশ্চিমে বেলেঘাটা খাল এবং খালের সংযোগস্থলে। সেখান থেকে হঠাৎ মোড় ঘুরে আছড়ে পড়ল মাতলার দিকে মিশে গেল করতোয়া ও আঠার ভাঙ্গা নদীর সঙ্গে—সম্মিলিত এই নদীত্রয় ঝাঁপিয়ে পড়ল সমুদ্রের বুকে নিজেদের পরিচয় বিলীন করে। বিদ্যাধরীর যে অংশ কলকাতার মধ্য দিয়ে এঁকে বেঁকে গেছে তার একমাত্র কাজ হল কলকাতার উপছে পড়া বৃষ্টির জল এবং পয়ঃপ্রণালী নিষ্কাশিত তৃষিত জলকে আশ্রয় দেওয়া। লবণহ্রদের ভেড়ির স্বার্থে বিদ্যাধরী হয়ে গেল লুপ্ত প্রায়। এর স্মৃতি চিহ্ন রয়ে গেল বেলেঘাটা ও টালির খালের মধ্যে। লবণহ্রদের আশে পাশের চাষবাসের জমি ভেড়ি মালিকদের ক্রমবর্দ্ধমান লোভের তাড়নায় নিঃশেষ হয়ে যাবার পথে। একের পর এক ভেড়ি দেখা দিল লবণহ্রদের বুকে। এখানে একটা কথা বলে রাখা যেতে পারে—যে ভেড়ি শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে জলরক্ষার জন্য নির্মিত বাঁধ কিন্তু চলতি কথায় এখন এর অর্থ দাঁড়িয়েছে মৎস্য চাষের জন্য বাঁধ দ্বারা রক্ষিত জলাশয়। আমাদের লবণহ্রদের ভেড়ি সেই অর্থেই ব্যবহার করা হয়েছে। এই বিদ্যাধরীকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করবার অনেক প্রচেষ্টা অনেক গবেষণা হয়েছিল। ১৯২২ খৃঃ অঃ ও সি লীজ সি, এস আই কে স্পেশাল অফিসার নিযুক্ত করা হয়। বিদ্যাধরীকে বাঁচাতে তারা রায় দিলেন যে—ধাপা থেকে ৯ মাইল লম্বা এক খাল কেটে একে পিয়ালী নদীর সঙ্গে যুক্ত করা দরকার।

২৪ পরগনায় ছড়িয়ে আছে ছোট বড় অসংখ্য জলাভূমি। লবণ-হ্রদ তাদেরই অন্যতম। নদী তার উদ্দাম গতিপথে তরঙ্গাঘাতে লোক-চক্ষুর অগোচরে অক্লান্ত পরিশ্রমের দ্বারা এইসব জলাভূমি সৃষ্টি করে

—মানুষ তার প্রখর বুদ্ধির দ্বারা এই জলাভূমিকে বহুমুখী কাজে লাগায়। কোথাও হয় ধানের চাষ, কোথাও হয়ে দাঁড়ায় বিরাট হোগলার বন। আবার কোথাও হয়েছে মাছেব ভেড়ি। লবণহ্রদ এইভাবে হয়ে গেল অসংখ্য মাছের ভেড়িতে পরিপূর্ণ। ২৪ পরগনায় এইসব বিল চারপাশে ছড়িয়ে আছে। কুলগাছি বিল, করিটি বিল, বায়রা বিল ইত্যাদি। লবণহ্রদ খ্যাতি লাভ করেছে কলিকাতার সান্নিধ্য-ধন্য হয়ে—প্রখ্যাত হয়েছে শহরে পরিণত হয়ে।

লবণহ্রদের মাটি পলিজ—পলিমাটি স্তরে স্তবে সাজান—গভীরতা ধবণীর অতলস্পর্শী—৪৮১ ফিট খনন করেও না পাওয়া গেছে শিলাস্তর না স্পর্শ করেছে সমুদ্রতল। ৩৮০ ফিট তলদেশে পৌঁছে জলীয় খোলক পাওয়া গেছে প্রচুর। কর্নেল গাস্ট্রেল লবণহ্রদ এবং তৎসংলগ্ন ভূপ্রকৃতি পরীক্ষা করে মন্তব্য কবেছেন যে সুন্দরবনেব বহু অংশের কোন না কোন সময যে কোন কাবণেই হোক অধোগমন হয়েছিল। —লবণহ্রদের খুব কাছে শিয়ালদহ স্টেশনের নিকট একটি গভীর পুকুব খনন করতে গিযে পাওয়া গেছে সুন্দরী বনের প্রচুর বৃক্ষশ্রেণী খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তাব দ্বারা সহজেই প্রমাণ হয় যে লবণহ্রদের নরম মাটি সুন্দরীবৃক্ষের ঘন সন্নিবেশজনিত অসহনীয় চাপের দরুন পলিজ মাটি আপনার বুক চিরে পথ কবে দিয়েছে ভূগর্ভের দিকে। তাই সেখানেই ভূস্তরে প্রোথিত এই বৃক্ষ শ্রেণী দেখা গেছে—সেখানেই হাজার হাজার বৃক্ষের একত্র সমাবেশ লক্ষ্য করা গেছে। আর্দ্রতার জন্যও হতে পারে আবার প্রবল বাত্যা বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গঘাতেও হতে পারে—আবার এও হতে পারে যে কোন সময় এক প্রবল ভূকম্পের ফলে হয়ত সুন্দরীবনের এক বিরাট সমাবেশ ভূতলে প্রোথিত হয়েছে।

কলকাতার পশ্চিমে ভাগীরথী আর পূর্বে লবণহ্রদ। এই লবণহ্রদ একটা বিশাল জলাভূমি—পরে সেই জলাভূমিকে পরিণত করা হল অসংখ্য ভেড়িতে আবার ভেড়ি ভরাট করে হল আমাদের লবণহ্রদ শহর। কলকাতা এই লবণহ্রদ থেকে যেমন আহরণ করত টাটকা মাছের

রাশি রাশি সন্তার তেমনি আক্রান্ত হত ঝাঁকে ঝাঁকে মশার দ্বারা। ম্যালেরিয়ার উৎস ছিল এই লবণহ্রদ। ইংরেজ সরকার বহু চেষ্টা করেও লবণহ্রদের মশক বংশ ধ্বংস করতে সক্ষম হয়নি—অথচ কলকাতার পূর্বাঞ্চল জুড়ে এই বিশাল জলাভূমিকে আয়ত্তাধীনে আনা দুঃসাধ্য মনে করে এর উত্তর দিকের যে অংশ কলকাতার পূর্ব সীমানার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত সেই অংশটির উন্নতি বিধানের ব্যবস্থা চলতে লাগল। লবণহ্রদের এই উত্তর ভাগ এর পশ্চিমে মাণিকতলা—দক্ষিণে নতুন কাটা খাল আর তার পূর্ব দিকে বিস্তৃত হয়ে মিশে গেছে সুন্দরবনের বিশাল অরণ্যের সঙ্গে। লবণহ্রদের এই উত্তরভাগের আয়তন ২৪০০ একর। এটা সমুদ্রের লেভেল থেকে ৪।৫ ফিট উঁচু। ভাগীরথীর তলদেশ থেকে পলিমাটি একে একে ভরাট করে একে অন্ততঃ ১১ ফিট উঁচু করার ব্যবস্থা হল—সেই জন্য শহর লবণহ্রদের একটা বৈশিষ্ট্য হল যে শহর কলকাতার তুলনায় বেশ কয়েক ফুট উঁচু। যার ফলে ১৯৭৮ সালের ভয়াবহ বন্যায় যখন সমস্ত কলকাতা ডুবু ডুবু তখন লবণহ্রদ শহরে আমরা ব্যাডমিণ্টন খেলছি। আগে শহর কলকাতার জলস্রোত এসে জমা হত শহর লবণহ্রদের বুকে আর এখন ব্যাপারটা গেছে উল্টে—শহর লবণহ্রদের জল উছলে পড়ে খাল গুলিতে, সেটা উপছে উঠলে কলকাতার নীচু জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে।

গঙ্গা থেকে পলিমাটি এনে ভেড়ি ভরাট করে লবণহ্রদ শহর তৈরী করার ভার পড়ল যুগোশ্লাভের NEDE এর ওপর।

২৪০০ একর জমি নিয়ে কর্ম-পরিকল্পনা তৈরী হল। এর মধ্যে ১৭৫ একর জমি রাখা হল দোকান পাট আর—বাজারের জন্য। হাসপাতাল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং খেলাধুলার জন্য রাখা হল ৩৮০ একর। এ ছাড়া শহরের সমস্ত রাস্তার আয়তন বাদ দিলে বসতবাড়ীর জন্য রইল ১১৫৫ একর। বসতবাড়ী এবং তার সংলগ্ন আশে পাশে সবুজ ঘাসে মোড়া থাকবে ৬৯০ একর। ব্যাপারটা দাঁড়াল যে কর্ম পরিকল্পনার ২৪০০ একর।

দোকানপাট ও বাজার ইত্যাদির জন্য রাখা হলো ১৭৫ একর, হাসপাতাল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং খেলার মাঠের জন্য ৩৮০ একর, বসতবাড়ীর জন্য ১১৫৫ একর, বসতবাড়ী ও তার সংলগ্ন সবুজ ঘাসে মোড়া জমির পরিমাপ ৬৯০ একর,—ব্যাপারটা দাঁড়াল যে কম´ পরিকল্পনার জন্য ২৪০০ একর। বসতবাড়ীর ঘনত্ব একর প্রতি ২৫, জনবসতি ঘনত্ব একর প্রতি ১২৫, বসতবাড়ীর মোট সংখ্যা ২৯,০০০, লোক সংখ্যা ১,৫০,০০০, লবণহ্রদ শহরের রাস্তার মাপ হল ৪৩ মাইল, ফুটপাথের মাপ হলো ৩৫ মাইল, জমির উচ্চতা সমুদ্রতল থেকে ১১ ফিট। খরচের অঙ্ক—৪½ কোটি টাকা।

পলিমাটির পরিমাণ ৮০ কোটি কিউবিক ফিট; গঙ্গা থেকে লবণ-হ্রদে মাটি আনতে ৫ মাইল লম্বা পাইপ বসানো হয়েছিল।

প্রস্তাব হল কাটা খাল ও বেলিয়াঘাটা খাল ভরাট করে কৃষ্ণপুর খাল ব্যবহার কবা হবে বৃষ্টির জল নিষ্কাশনের জন্য এবং একটা খাল (বাণ্টোলা) কেটে বাণ্টোলাতে ফেলা হবে উপছে পড়া জল।

পলাশীর প্রান্তরে মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতা করে দিল ক্লাইভকে সর্ব্বেসর্ব্বা—তিনি হুকুম দিলেন, কলকাতার জঙ্গল কেটে যে বসতবাড়ী করতে চাইবে তাকেই দেওয়া হবে বাসের অধিকার, জমি বিনামূল্যে, সুবিধা প্রচুর—ইংরেজের সান্নিধ্যে-এই লোভে পড়ে ছুটে এল দলে দলে মানুষ বাংলা দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। রাজা রাজবল্লভ এলেন সুতানুটিতে। রাজা গুরুদাস আড্ডা গেড়েছেন নতুন বাজারে, ঠাকুর পরিবার বাসা বাঁধলেন পাথুরিয়া ঘাটায়—কান্তবাবু বাড়ী করলেন পাইকপাড়ায়—গৌরী সেন এলেন বড় বাজারে। তখন লবণহ্রদ নিস্তরঙ্গ জলাভূমির মধ্যে সুপ্তিমগ্ন। মাঝে মাঝে ঘুমের ব্যাঘাত হয় দূরাগত ব্যাঘ্রগর্জনে আর শেয়ালের হুক্কাহুয়ায়। মশকের গুঞ্জনধ্বনি মানুষকে খুঁজে পেত না—প্রকৃতির শূন্য প্রাঙ্গনে বৃথাই গুমরে মরত।

কলকাতা ধাপে ধাপে এগিয়ে চলেছে। সুতানুটি আর গোবিন্দপুর কলকাতার জনস্রোতে ভেসে গেছে, বিংশ শতাব্দীর শহর কলকাতা

বিশ্বের আসন পেয়েছে সমৃদ্ধিতে, শিক্ষায় এবং সংস্কৃতির গরিমায়। গ্রামবাংলাকে নিঃশেষ করে শহরটি ফেঁপে ফুলে এক বিরাট আকার ধারণ করেছে। ৫৩৩ স্কোয়ার মাইলের এই শহরটির মাত্র ১৪০ স্কোয়ার মাইল কেতাদুরস্ত এরই মধ্যে সকলে ঠাঁই করে নিতে চায়। প্রায় ষাট লক্ষ লোক ১৯৬১ সালে এই স্বল্পপরিসর জায়গার মধ্যে মাথা ঠোকাঠুকি করে। কলকাতার জনসংখ্যা অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পেয়েছে বঙ্গ বিভাগের ফলে। সেখানে যত এঁদো পচা ডোবা ছিল সব ভরাট করে বসতবাড়ী তৈরীর হিড়িক পড়ে গেল। লবণহ্রদের দিকে নজর পড়ল।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে লবণহ্রদের বিস্তৃত জলাভূমি শহর কলকাতার এক আতঙ্ক স্থল ছিল—জব চার্ণকের যুগে। বিশেষ করে এটা ভয়াবহ হয়ে উঠত গ্রীষ্ম কালে। গরমে জল যেত শুকিয়ে আর বিলের মাছ-গুলো পচে ছড়িয়ে দিত দুর্গন্ধ। দক্ষিণে হাওয়া বয়ে নিয়ে যেত এই পূতি-দুর্গন্ধময় আবহাওয়া লবণহ্রদ থেকে সোজাসুজি শহরের মধ্যে। লবণহ্রদের আগাছার জঙ্গল ঘন হয়ে উঠত—মারাঠা ডিচ পার হয়ে এবং এর বিস্তৃতি গিয়ে পৌঁছত সুতানুটি কলকাতার প্রায় শেষ প্রান্তে। —এখন সেখানে গভর্ণমেণ্ট হাউস বিরাজমান। তখনকার কলকাতা ছিল কুয়াশা—কুমীর ও বন্য শূকরের আড্ডাস্থান। রিয়াজু এস, যালটিনের মতে এর হাওয়া ছিল পুতিদুর্গন্ধময়, জল লবণাক্ত—আর মাটি স্যাঁতসেঁতে। বছরের আট মাসের আবহাওয়া ছিল ভয়াবহভাবে অস্বাস্থ্যকর আর, বাকী ৪ মাসের আবহাওয়া বলা যায়, মারাত্মকভাবে অস্বাস্থ্যকর নয়।

সমস্ত লবণহ্রদ এলাকাটিকে ৫টি সেকটরে ভাগ করা হয়েছে। তার মধ্যে প্রথম সেক্টরটি ৯৩৫ একর জমি সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত বসতি স্থাপনের জন্য—রাস্তাঘাট, পয়ঃপ্রণালী, জলের ব্যবস্থা সবকিছু প্রস্তুত ১৯৭০-৭১ এর মধ্যে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় সেক্টরের এলাকা যথাক্রমে ৫৬৫ ও ৯৩২ একর। অর্দ্ধেকের বেশী কাজ সমাপ্ত হয়েছে ঐ সময়ের মধ্যে। ৪র্থ ও ৫ম সেক্টরের প্রস্তুতি চলছে।

ইতিহাসের পাতায়

লবণহ্রদ পরিকল্পনা রূপায়ণের সময় একটি প্রশ্ন উঠেছিল যে কলকাতা শহরে যেখানে ১২ লক্ষ লোক ঘিঞ্জি নোংরা বস্তিতে বাস করে এবং যেখানে শতকরা প্রায় ৩০ জনের মাথার উপর কোন আচ্ছাদন থাকে না এবং বিশেষ করে লবণহ্রদ যখন কলকাতার সবচেয়ে ঘিঞ্জি নোংরা বস্তি দ্বারা পরিবেষ্টিত সেক্ষেত্রে লবণহ্রদকে একমাত্র উচ্চমধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের একচেটিয়া উপনিবেশে রূপায়িত করা বাস্তব-সম্মত কিনা। শহর কলকাতার ক্রমবিকাশ পর্যালোচনা করলে দেখতে পাওয়া যায় যে সেখানে আকাশ ছোঁয়া যে কোন প্রাসাদকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয়েছে এক একটি বস্তি—ধনীর ধনমর্যাদা, মানীর মান-সম্ভ্রম রক্ষা করতে। অভিজাত সম্প্রদায়ের আভিজাত্য অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে প্রয়োজন বস্তির, মিশ্র ও ঘন বসতি। সম্রাটের প্রয়োজন দৌবারিকের—সম্রাজ্ঞীর প্রয়োজন সহচরীর, গৌরী সেনের দরকার খাজাঞ্চীর—বিচারকের দরকাব পেস্কারের—তেমনি যে কোন উপনিবেশ সুষ্ঠুভাবে গড়ে তুলতে গেলে প্রয়োজন মিশ্রবসতির। লবণহ্রদ পরিকল্পনায় এব অভাব রয়ে গেছে। আমরা বাস করি ভাবতীয় সমাজতন্ত্রের আওতায়। সাম্যবাদের প্রভাবের জন্য পশ্চিমবঙ্গ অন্যান্য প্রদেশ হতে অনেক এগিয়ে আছে। সাম্যবাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত শহর কলকাতার এত সন্নিকটে থেকে একটি বিশেষ গোষ্ঠীর উপনিবেশ স্থাপন করে উচ্চমধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের একচেটিয়া উপনিবেশ স্থাপন করা কতটা যুক্তিসঙ্গত ও কতটা বাস্তব-বাদ সম্মত সেটা বিবেচ্য। একটি সুসংহত সমাজ গড়ে তুলতে চাই সমাজের সর্বস্তরে মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টার। তথাকথিত নিচুস্তরের সম্প্রদায়কে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র উচ্চস্তরের সম্প্রদায়কে নিয়ে কোন উপনিবেশ সম্পূর্ণ হতে পারে না। লবণহ্রদ পরিকল্পনার এই বিরাট ফাটল বোজাতে হচ্ছে ঝোপড়ি এবং ঝোপড়ির পরিবারের বংশবৃদ্ধি দ্বারা।

এই মিশ্র বসতির প্রস্তাবে অনেকেই হয়ত নাসিকা কুঞ্চিত করবে —কিন্তু আজ যাদের দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে দূরে ঠেলে রাখার চেষ্টা

চলছে অথচ যাদের না হলে উচ্চমধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের দৈনিক জীবন অচল হয়ে পড়ে, এমন দিন হয়ত বেশী দূরে নয় যখন এরাই দলগত ভাবে বিদ্রোহ করবে এই একচোখো পরিকল্পনার বিরুদ্ধে। এর গুরুত্ব আমাদের নিশ্চয় ভেবে দেখবার সময় এসেছে। উচ্চমধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের স্বার্থপরতা সীমাহীন। এরা নিজেকে নিয়ে এত বেশী মগ্ন যে প্রতিবেশীকে উপেক্ষা করা এবং অসহযোগিতার মধ্যে কোন অস্বাভাবিকতা খুঁজে পায় না। নিজেকে নিয়ে সদাই বিব্রত এবং তারই মধ্যে খুঁজে পায় আত্মতৃপ্তি। এদের উদ্দেশ্যেই হয়ত কবির বাণী উচ্চারিত হয়েছে :

মানুষের পরশেরে প্রতিদিন
ঠেকাইয়া দূরে
ঘৃণা করিয়াছ তুমি মানুষের
প্রাণের ঠাকুরে।
বিধাতার রুদ্ররোষে দুর্ভিক্ষের
দ্বারে বসে
ভাগ করে খেতে হবে সকলের
সাথে অন্নপান।
অপমানে হতে হবে তাহাদের
সবার সমান॥

একটি উদাহরণ দিলেই বুঝতে পারবেন যে আমরা কত স্বার্থান্ধ এবং আত্মকেন্দ্রিক। দিনের বেলা চোর সাইকেল নিয়ে পালাচ্ছে—পিছনে ছুটলাম, আশে পাশের বাড়ী হতে একটা লোকও এগিয়ে এল না সাহায্য করতে, বেরিয়ে এল ঝোপড়ির বাসিন্দারা। রাতের অন্ধকারে চোর ধরা পড়ল—তার সঙ্গে ধস্তাধস্তি চলছে—অতি নিকট প্রতিবেশী যারা আমাদের সুখদুঃখের সঙ্গী, জানালা দরজা আরও শক্ত করে কষে বন্ধ করে নিশ্চিত আরামে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ে।

১৯৭০ সালে লবণহ্রদের ভবিষ্যত বাসিন্দাদের মনে একটা ভীতি,

অনিশ্চয়তা ও দ্বিধা দেখা দিয়েছিল। একদিকে পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ কলকাতার উপকণ্ঠে মানুষের জীবন নিয়ে চলছে ছিনিমিনি। বাড়ী তৈরীর জিনিষপত্র সাধারণ লোকের পক্ষে ধরা ছোঁয়ার বাইরে, অনেকে জমি বিক্রি করে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন—অনেকে সুদিনের অপেক্ষায় হাত পা গুটিয়ে বসে রইলেন। যাঁরা এগিয়ে এলেন তাঁরা দেখলেন—যে, না আছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, না আছে বাজার ঘাট—না আছে যান বাহনের কোন সুব্যবস্থা। অন্যদিকে কর্তৃপক্ষও ভাবছে কার জন্য গড়ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান—কার জন্য ব্যবস্থা করব বাজার ঘরের—আর কার জন্যই বা হবে যানবাহনের ব্যবস্থা। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠে পরিকল্পনাকারীদের কাছে প্রথমে বসতি স্থাপন না প্রথমে জীবন যাত্রার প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান গুলির পত্তন পরে বসবাসকারীদের আগমন। এই প্রশ্নদুটি দুষ্ট চক্রের মত কাজ করে। দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানগুলি গড়ে না উঠলে যেমন বসতি স্থাপন সম্ভব নয়, তেমনি বসতিস্থাপন না হলে প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানগুলির নির্মাণ অনাবশ্যক মনে হয়। এই দুষ্ট আবর্তের মধ্যে পড়ে লবণহ্রদের অগ্রগতি বাধা পেল। ফলে বেশ কিছুদিন পর্যন্ত লবণহ্রদ মরুভূমির বালুরাশির তপ্ত আবহাওয়ার প্রভাবে নিঝুম হয়ে রইল। এই নিঃসঙ্গ লবণহ্রদে যারা নির্বিকার চিত্তে মনের সুখে বংশবৃদ্ধি করতে লাগল—তারা হল রাতের মশা আর দিনের মাছি। অবশ্য ১৯৭১-৭২ সালে দুঃসাহসিক ও পথপ্রদর্শক কয়েকজন এখানে বসতি স্থাপন করেছিলেন—তাঁদের কাছে আমরা সত্যই কৃতজ্ঞ। লবণহ্রদের সবকিছু পরিকল্পনার অগ্রগতিতে বাধা পড়ল ১৯৬২ সালে ভারত-চীন যুদ্ধ ও ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান লড়াই এর জন্য। যারা জমি কিনেছিল তারা বাড়ী তৈরী করতে দ্বিধায় পড়ল। যুদ্ধের দরুণ দেখা দিল অনিশ্চয়তা, ব্যবসা-ক্ষেত্রে এল এক অসহনীয় মন্দা। লবণ হ্রদ পরিকল্পনা এক মস্ত বড় হোঁচট খেল। ভেড়ি ভরাট করা জমিগুলো খাঁ খাঁ করতে লাগল। এর চলতি নাম হল বালুর মাঠ।

এই দারুণ সমস্যার সমাধানে এগিয়ে এলেন পুরুষ সিংহ বিধান রায়—তাঁর মানসী কন্যার উন্নতি বিধানে ছুটলেন রাজধানীতে। লবণ-হ্রদ পরিকল্পনা স্বীকৃতি পেল সর্বভারতীয় সমস্যারূপে। প্রতিষ্ঠিত হল Calcutta Metropolitan Development Authority, ৪র্থ জাতীয় পরিকল্পনায় এরজন্য মঞ্জুর হল ১৫০ কোটি টাকা। CMDAর এই ১৫০ কোটি টাকার পরিকল্পনা লবণহ্রদ পরিকল্পনার অগ্রগতিতে প্রচুর সাহায্য করল। অর্থাভাবে ঝিমিয়ে পড়া অবস্থা থেকে মাথা তুলে দাঁড়াল লবণহ্রদ পরিকল্পনা।

১৯৮০ সালে যারা মশকের দংশনে অস্থির হয়ে লবণহ্রদকে অভিশাপ দেন, তাঁরা সান্ত্বনা পাবেন যদি তাঁদের পূর্ববর্তী অধি-বাসীদের কাছ থেকে লবণহ্রদের মশক বংশের দৌরাত্ম্যের ইতিহাসের সঙ্গে ওয়াকিবহাল হন। শুধু মশা নয়, মশার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলত মাছি। সাপের চলাফেরাও ছিল অবাধ। এছাড়া টিকটিকি, আরশোলা ইঁদুর এরা সমস্ত জাঁকিয়ে ছিল। অবশ্য এখনও যে খুব কম আছে তা নয়। ১৯৭০ ও ১৯৮০এ এই এক দশকের ব্যবধান বিশেষভাবে উপলব্ধি করা যায়। ১৯৭০ প্রথম বসতি স্থাপন করেন শ্রীজিতেন চক্রবর্ত্তী ও শ্রী শরদিন্দু ব্যানার্জি। প্রথম জন বাসা বাধলেন এবি ব্লকে আর দ্বিতীয়জন বাড়ী তৈরী করলেন সি এফ ব্লকে। বালুর মাঠের দুই প্রান্তে। সেই সময় রাতের অন্ধকারে পালঙ্কের নিচে সাপ ধরে আছে ব্যাঙ, পালঙ্কের আশে পাশে মশকের গুঞ্জন আর পালঙ্কে শুয়ে সিলিং এর দিকে তাকালে দেখা যেত মাছির আণ্ডিল। সারারাত ধরে ইঁদুরের উৎপাত। মশার যে কি উৎপাত সে ভাষায় প্রকাশ করা একপ্রকার অসম্ভব। একদিন সন্ধ্যায় আমেরিকা থেকে সদ্য প্রত্যাগত এক বন্ধুর বাড়ীতে গিয়ে দেখি তিনি টুইষ্ট নাচের মহড়া দিচ্ছেন—ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করাতে জানা গেল যে মশক বিতাড়নের জন্য এই কসরৎ অভ্যাস করছেন। মশারির চার দেয়ালের মধ্যে বসে সেতার শেখা—দাবা খেলা—পড়াশুনা করা এ সব ত ছিল অতি সাধারণ ব্যাপার।

আর পানীয় জল—যেমন তার আস্বাদ, তেমনি তার রং, সংসার-ত্যাগী সন্ন্যাসী হবার ইচ্ছে থাকলে তার পয়সা খরচ করে কাপড় ছোপাতে হত না। কয়েকদিন ধরে কলতলায় কাপড় ফেলে রাখলেই কাপড় গেরুয়া রঙে রঙিন হয়ে যাবে। তারপর স্নানের ঘরের মোজাইকের চেহারা কয়েক মাসের মধ্যে এক অপরূপ রঙে চিত্রিত হয়ে যাবে।—সেদিকে বেশীক্ষণ তাকিয়ে থাকলে ভীরমি ধরে যাবে। পানীয় জলের রঙের কথা'ত শুনলেন তার স্বাদ ছিল লবণাক্ত। লবণ হ্রদের বিস্তৃতি মিশে আছে সুন্দরবনের সঙ্গে—আর সুন্দরবন হল লবণাম্বুরাশির উপকূলে। মানুষের প্রচেষ্টায় সমুদ্রের জলতরঙ্গের প্রসার বন্ধ হয়েছে—কিন্তু লবণাম্বুরাশি ধরিত্রীর রন্ধ্রপথে প্রবেশ করে লবণহ্রদের ভূস্তরের জলকণাগুলি লবণাক্ত করে তুলেছে। তাই পানীয় জলের নোনা আস্বাদ পানীয়ের প্রতি বিতৃষ্ণা এনে দিত। তবে আমাদের হয়ত একটা সান্ত্বনা আছে যে আমাদের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী উপদেশ দিতেন শিবাম্বু পান করতে। আশা করা যায় শিবাম্বুর আস্বাদ লবণহ্রদের লবণাম্বুর আস্বাদ হতে খুব বেশী বিস্বাদ নাও হতে পারে। কারও যদি সন্দেহ থাকে এ ব্যাপারে একবার পরখ করে দেখতে পারেন। শহর লবণহ্রদ রূপায়ণে মন্থরতা দেখা দিল শহর কলকাতা থেকে এর বিচ্ছিন্নতার দূরত্বের জন্য। ১৯৭৪ সালে লবণহ্রদে বসতি স্থাপনের সূত্রপাতের প্রায় ৪ বছর পরেও কোন যান-বাহন ছিল না বল্লেই চলে। ১৯৭৫ সালের গোড়ার দিকের কথা ৯ নং রুটের বাস চালু হয়েছে মাণিকতলা থেকে লবণহ্রদ সাটল সার্ভিস, সেটাও চলে যেত লাবণির দিকে পাঞ্জাব ব্যাঙ্ক হয়ে। এক ছুটির দিন সদলবলে আমরা পাঞ্জাব ব্যাঙ্কের সামনে ৯ নং বাস আটক করলাম। বেশ খানিকক্ষণ রাস্তা অবরোধ করার পর কর্তাব্যক্তিরা এসে হাজির—অনেক বাকবিতণ্ডা আলাপ আলোচনার পর শেষ পর্য্যন্ত ৯ নং রুট ৪ নং ট্যাঙ্ক পর্য্যন্ত বাস চালু হবার প্রতিশ্রুতি নিয়ে আমরা সব বাড়ী ফিরলাম। সেই প্রথম বাস দেখা দিল পাঞ্জাব ব্যাঙ্কের পূর্বদিকে ৪

নং ট্যাঙ্কের সীমার মধ্যে। একে একে কত বাস এল, কত বাসের রূপ বদলাল—কিন্তু সেদিনের সেই প্রথম বাসটি যখন ৪ নং ট্যাঙ্কের সীমানা পেরিয়ে সেচভবনের দিকে যাত্রা করল—সেদিনটি একটি স্মরণীয় দিন। ভোলানাথ সেন তখন মন্ত্রী—CMDA এর সভাপতি। বাসের সংখ্যা বাড়ানোর দাবী জানিয়ে তার কাছে পেশ করা এক স্মারকলিপির উত্তরে তিনি জানালেন যে এমন একদিন আসবে লবণহ্রদের যখন বাসের ঘড়ঘড়ানির শব্দে আপনাদের দিবানিদ্রার ব্যাঘাত ঘটবে। আমরা সেদিনটির প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে বসে আছি। ১৯৮০ সালে আমরা লবণহ্রদে যানবাহনের উন্নতি দেখেছি অনেক, অবশ্য তুলনামূলকভাবে প্রয়োজনের তুলনায় নয়।

যানবাহনের আরও অনেক উন্নতির প্রয়োজন—যখন কোন স্মারক-লিপি পেশ করা হয় কর্তাব্যক্তিদের কাছে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়—এবং একটা রঙীন ছবি সামনে তুলে ধরা হয় যার জন্য মন্ত্রী মহোদয়কে ধন্যবাদ দিয়ে চলে আসার কয়েকদিনের মধ্যে আমাদের ভুল ভাঙ্গে। রাজনীতির একটা বিরাট চালই হল সাধারণকে ধোঁকা দাও বড় বড় কথা বলে—চোখে পরিয়ে দাও রঙীন চশমা—আদায় করে নাও জয়ধ্বনি আর ব্যালট বাক্সে ভোটটি। তারপর বের কর গদিতে বসে মনগড়া অজুহাতের ঝুড়ি-তাক লাগিয়ে দাও কথার ফোয়ারায়—ভেঙ্গে ফেল পুরাতন যত সব প্রতিশ্রুতি। আবার নতুন করে সাজাও বক্তৃতার মালমশলা। কাটিয়ে দাও পাঁচশালা বন্দোবস্তের পাঁচটি বছর তখন নতুন করে প্রস্তুত কর প্রতিশ্রুতির ফর্দ্দ—তাক লাগিয়ে দাও তোমার কেরামতি দেখিয়ে। এই হল রাজনীতির ভেল্কিবাজী। যখনই গেছি আমরা দলবদ্ধভাবে কোন বড়কর্তার কাছে যানবাহনের দাবী নিয়ে সব সময় পাওয়া গেছে অফুরন্ত প্রতিশ্রুতি—সঙ্গে করুণার দু-একটি ছিটে ফোঁটা।

শহর কলকাতার প্রাণকেন্দ্র থেকে মাত্র তিন মাইল দূরত্বের মধ্যে যে ছয় স্কোয়ার মাইলের এই বিরাট উপনিবেশটির ভবিষ্যত সত্যি

কলকাতার গর্বের বিষয়।

আজি হতে বিংশতি বর্ষ পরে শহর লবণহ্রদের চিত্র যে কোন শিল্পীর মনে প্রেরণা জাগাতে পারে। যানবাহন যা কিছু চলছে বর্তমানে উত্তর কলকাতায় এবং তার সীমান্তবর্ত্তী অঞ্চলগুলির যোগাযোগ স্থাপন করে—মাঝে মাঝে বিচ্ছিন্ন ভাবে যার টার্মিনাসগুলি ছড়িয়ে আছে—সে সব গুটিয়ে নিয়ে এসে লবণহ্রদের পূর্ব সীমানায় এক টার্মিনাস তৈরি হবে। উত্তর কলকাতার সব যানবাহন আশ্রয় পাবে শহর লবণহ্রদের বুকে। এর রাস্তাঘাট সব ধন্য হয়ে উঠবে ষষ্ঠ চক্র বা অষ্টচক্র যানের দ্বারা চালিত যানের আনিত শহর কলকাতার ধূলিকণায়। লবণহ্রদ স্থান পাবে যানবাহনের মানচিত্রে এক উজ্জ্বল তারকার মত। পৃথিবীর সংস্কৃতির মানচিত্রে যেমন স্থান পেয়েছিল রোম—গর্ব করে বলা হত All roads lead to Rome ভবিষ্যতের লবণহ্রদও হবে যানবাহনের এক প্রাণ কেন্দ্র। লবণহ্রদ থেকে শুধু ডিহি কলকাতার বা তার আশে পাশের শহরগুলির সঙ্গে যোগ স্থাপন হবে তাই নয়—এই শহরের সঙ্গে একটানা রাস্তা দিয়ে হাওয়াই আড্ডার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পৃথিবীর সঙ্গে এর যোগসূত্র স্থাপন হবে। মানিকতলার রেলব্রীজের নীচের রাস্তা ঢালু করে আনা হচ্ছে দোতলা বাস। পরিকল্পনায় আছে উল্টাডাঙ্গার ব্রীজের নীচে ও অনুরূপ ঢালু করে আনা হবে দোতলা বাসের সারি চলবে একতলা বাস চলবে ডবলডেকার সঙ্গে থাকবে স্কুটার সারি সারি। রিক্সার টুং টাং আর ট্যাক্সির ভেঁপুতে লবণহ্রদ হয়ে উঠবে নয়া কলকাতারূপে রূপায়িত।

জঙ্গলের মধ্য দিয়ে—রাস্তার নাম হয়েছিল কালীঘাটের পথ। পায়ে ঠেকত মাথার খুলি—ঘাসের মধ্যে দিয়ে চলে যাচ্ছে বিষধর সর্প—মাথার ওপর শব্দ শোনা যায় শকুনি—গৃধিনী দলের পাখার ঝাপটার। তারপর কলকাতা খোলস বদলাতে শুরু করল। পাল্কীর প্রচলন হল সর্ব্বত্র। ধনী সম্প্রদায়ের প্রত্যেক বাড়ীতে থাকত বেহারার দল আর পাল্কীর বহর। প্রতিযোগিতা চলতো পাল্কীর সৌন্দর্য্য ও

ঐশ্বর্য্যের। পাল্কী চলত ঢুল্কি তালে মেঠো রাস্তা দিয়ে। পর্দানশীন মহিলারা যেতেন পাল্কী করে গঙ্গা স্নানে—আব্রুরক্ষার্থে পাল্কী সমেতই ডুব দিয়ে পুন্যার্জন করতেন। পাল্কী পাহারার জন্য সঙ্গে যেত বরকন্দাজের দল—সঙ্গে সঙ্গে পায়ে হেঁটে যেত দাস দাসীরা—সে এক ছোটখাট শোভাযাত্রার রূপ নিত। পাল্কীতে রাজবাড়ীর মেয়েরা ঘোমটা দিয়ে বসতেন আবার পাল্কীর চারিপাশে ঘেরাটোপ দিয়ে ঘিরে রাখা হত আব্রু রক্ষার জন্য।

পাল্কী চড়ার অধিকার অবশ্য সকলের ছিল না। উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারীরাই শুধু পাল্কী চড়তে পারত। দেশীয় ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যেও এই বাধানিষেধ ছিল—পদমর্য্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিরাই পাল্কী চড়তে পারতেন। সাধারণ কর্মচারীরা চলত ছাতা মাথায় দিয়ে। পথের মাঝে মাঝে ছাতাবরদার পাওয়া যেত—তাদের ব্যবসা ছিল লোকের মাথায় ছাতা ধরে জীবিকা নির্বাহ করা। পাল্কী চড়ার মধ্যে ছিল এক রকম অভিজাত্য। পরিবারের মহিলারা পাল্কী-যান পছন্দ করতেন। এক মজার ঘটনা হল একবার পাল্কী নিয়ে। বেহালায় সাবর্ণ চৌধুরীর কাছারী বাড়ী—ধুমধাম করে সর্বজনীন কালীপূজা হয় এখানে। স্থানীয় ছেলেরা চাঁদা তোলার নামে অনেক অত্যাচার করে থাকে। প্রায়ই পাল্কী থামিয়ে মহিলার কাছ থেকে জোর জুলুম করে অর্থ সংগ্রহ করা একটা রেওয়াজ হয়েছিল। তখন মরিস সাহেব কলকাতার ফৌজদার কড়া মেজাজের লোক। চার বেহারার এক পাল্কী নিয়ে চল্লেন বেহালার পথ দিয়ে—নিজে পাল্কীর মধ্যে বসে রইলেন মহিলার বেশে। দূর থেকে সুসজ্জিত পাল্কী দেখে পাড়ার মাস্তানেরা জোর করে পাল্কীর দরজা খুলেছে—আর যায় কোথা। গাট্টাগোট্টা শণ্ডামার্কা মরিস।

১৮৭৯ সালে সলাপরামর্শ সুরু হল, কলকাতার ট্রাম লাইন বসানোর—কিছুদিন পূর্বে ট্রামলাইন বসানোর চেষ্টা হয়েছিল—কিন্তু সেটা ব্যর্থতায় পর্য্যবসতি হয়েছিল বলে অনেকদিন আর কোন ট্রাম

লাইনের কথা উত্থাপন করেনি। এদিকে বম্বেতে ট্রামের পরিকল্পনা রূপায়িত হয়েছে এবং লাভজনক ব্যবসা বলে স্বীকৃতি পেয়েছে। বম্বে ট্রাম কোম্পানীর মালিক এবং পরিচালক সবই আমেরিকান ঝানু ব্যাবসায়ী। কলকাতায় ট্রাম চালু করবার সিদ্ধান্ত শেষ পর্য্যন্ত চূড়ান্ত-ভাবে গৃহীত হল জনসাধারণের প্রতিনিধি কলকাতার কমিশনের দ্বারা আহুত এক সভায়। কলকাতায় ট্রাম চালু হল ১৮৮০ সালে। ১৮৮২ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী বিদেশ হতে উন্নত ধরনের ইঞ্জিন জুড়ে দেওয়া হল ট্রামের সঙ্গে। ইঞ্জিনটির বিশেষত্ব ছিল এর শব্দহীনতা এবং এর চারদিকে ভেনিসিয়ান কাঠ দিয়ে মোড়া—যে কোন অবস্থার অতি ক্ষিপ্রগতিতে গাড়ীর গতি বন্ধ করা যায়। এর শব্দ এত কম যে ট্রাম চলার সময় আশে পাশের চলতি ঘোড়ার ভয় পাবার কোন সম্ভাবনা থাকবে না। এই ইঞ্জিনে ছিল ষোল ঘোড়ার শক্তি। ট্রাম চালু হবার কিছু পরেই সুরু হল বাসের যাতায়াত। খুব সম্ভব ১৯৩০ সালে কলকাতার রাস্তায় প্রথম দেখা দেয় দোতলা বাস। জৈডকা কোম্পানী যেদিন প্রথম চালু করল দোতলা বাস সেদিন বিনে পয়সায় সারাদিন ধরে চড়তে দেওয়া হয়েছিল। দোতলায় আচ্ছাদন ছিল না। সন্ধ্যের দিকে ঐ দোতলা বাসে উন্মুক্ত আকাশের নীচে বসবার হিড়িক পড়ে যেত।

লবণহ্রদের বুলেভার্ড হবে সেচ ভবনের সামনে দিয়ে যে রাস্তা চলে গিয়েছে একদিকে বেলেঘাটার দিকে আর একদিকে মিশে যাবে কেষ্ট-পুরের খালের কিনারায়। সেখান থেকে প্রস্তাবিত বিস্তৃত পুল পার হয়ে ছুটে চলবে ভি, আই, পির ওপর দিয়ে একেবারে দমদম হাওয়াই আড্ডার দোর গোড়ায়। সেখানে যে কোন হাওয়াই জাহাজে চেপে চলে যান পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে। প্রস্তাবিত বুলেভার্ডের দুই পাশে থাকবে দেবদারু গাছের সারি—তার পাতায় পাতায় দখিনা হাওয়া খেলবে আর পত্র পল্লবের মৃদুমর্মর রিনি কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিবে, আকুল করিবে সবার প্রাণ। দুই প্রান্তে তরুবীথির মধ্য দিয়ে

ছুটে চলবে অজস্র অ্যাম্বেসাডার মাঝে থাকবে দু-চার খানা মার্শিডিজ, পিছে পিছে ধাওয়া করবে স্কুটার আর অটো রিক্সার দল—অলি গলিতে হাতটানা আর সাইকেল রিক্সার দল সপ্রতিভ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবে ধাবমান অভিজাত গাড়ীগুলোর দিকে। দুই পাশে সুপ্রশস্ত ফুটপাথের ওপর দিয়ে চলবে বিশাল জনস্রোত। সেচভবনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠবে এক বিরাট কর্মকেন্দ্র—সেটা যে শুধু হবে লবণহ্রদের প্রাণকেন্দ্র তাই নয়, সেটা হয়ে দাঁড়াবে সমস্ত কলকাতার প্রাণকেন্দ্র। দশটা-পাঁচটায় কেরাণীকুলের উদ্দাম গতিতে রাস্তা থাকবে ভরপুর। দুপুরে দেখা যাবে অগণিত শোভাযাত্রা—তাদের হাজার হাজার কণ্ঠের সোচ্চারে দিগদিগন্ত মুখরিত হয়ে উঠবে। সন্ধ্যায় দেখা যাবে জোড়ায় জোড়ায় চলেছে হাত ধরাধরি করে সান্ধ্য ভ্রমণে। রাস্তার দুপাশে দেখা যাবে অগনিত দোকানপাট-কাফে রেস্তোঁরা কলকাতার চৌরঙ্গীকে ম্লান করে দিয়ে কেঁপে উঠেছে লবণহ্রদের রাস্তাঘাট—আর ডালহাউসি স্কোয়ারকে পেছনে ফেলে এগিয়ে চলেছে লবণহ্রদ।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নতুন কলেবর নিয়ে দেখা দেবে লবণহ্রদের বুকে। নামী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি একে একে আবার নতুন করে বাসা বাঁধবে শান্ত সমাহিত এই লবণহ্রদের বুকে।

লবণহ্রদের ষ্টেডিয়াম হবে এশিয়ার বৃহত্তম ষ্টেডিয়ামগুলির অন্যতম। ষ্টেডিয়ামের ক্রিকেট পীচে ব্যাট আর বলের লড়াই চলবে সারা শীত-কাল। শীতের মিষ্টি রোদের নীচে বসে কমলালেবুর খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে উপভোগ করবেন আন্তর্জাতিক ক্রিকেট প্রতিযোগিতা। সেখানে খেলতে আসবে ব্রাডম্যানের বংশধরেরা, ওয়ালকটের ছেলে-পুলেরা—মাঠের এককোণে লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন মাড়োয়ারী সম্প্রদায়ের এক বিরাট গোষ্ঠি বসে গেছে খেলা দেখার নামে সুপরি-কল্পিত ভোজসভায়। ঝুড়িতে রয়েছে কমলা, আপেল, কলা, ডিব্বায় রয়েছে আখরোট-কিসমিস বাদাম। একত্রে এসেছে শ্বশুর-শ্বাশুড়ী-জামাই—বাড়ীর সকলে। হাততালি দিচ্ছে অন্যের অনুকরণে,

সমালোচনা করছে না বুঝে। ফাঁকে ফাঁকে আলোচনা চলছে শেয়ার মার্কেটের ওঠা নামা নিয়ে, লবণহ্রদের বাড়ীভাড়ার সমস্যা নিয়ে, ব্যবসার লাভ লোকসান নিয়ে। মাঠের চারিপাশে ছড়িয়ে বঙ্গসন্তানের দল— পকেটে চিনেবাদাম, হাতে খবরের কাগজ, পায়ে উলের মোজা— আলোচনা চলছে অতীতের ক্রিকেটের গৌরবময় অধ্যায় নিয়ে, রাজনীতিতে নেতাদের উত্থান পতন নিয়ে। যাতায়াতের দুর্ভোগ, জিনিষপত্রের ক্রমবর্দ্ধমান মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে, দেশীয় ক্রিকেটের নিম্নমান এবং অতীতের গৌরব কাহিনী নিয়ে।

ষ্টেডিয়ামে যাবেন ফুটবল খেলা দেখতে সেখানে বাইরে থেকে আসবে নামী নামী খেলার দল—আসবে পাঞ্জাব থেকে, আসবে বোম্বে থেকে, মাদ্রাজ, দিল্লী, হায়দ্রাবাদ থেকেও আসবে ফুটবল খেলোয়াড়রা, এ ছাড়া আন্তর্জাতিক দলগুলিও এসে যাবে রুশ-চীন-ব্রাজিল থেকে, আসবে দলে দলে—লবণহ্রদের বুকে উৎসাহ, উৎকণ্ঠা, উত্তেজনার বন্যা বয়ে যাবে ষ্টেডিয়ামকে কেন্দ্র করে। ইষ্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের খেলার জের চলবে ব্লকে ব্লকে।

ষ্টেডিয়ামে স্পোর্টসের প্রতিযোগিতা চলবে জাঁকজমকের সঙ্গে হয়ত আমাদের ভাগ্যে একদিন জুটে যাবে বিশ্ব অলিম্পিকের খেলা। সত্যিই কি আসবে সেদিন লবণহ্রদের ভাগ্যে—চিন্তা করতেও শিহরণ জাগে।

একটি চিড়িয়াখানার প্রস্তুতি চলছে। চিড়িয়াখানায় কি কি থাকবে তার জল্পনা কল্পনাও চলেছে। হয়ত গিরের জঙ্গল থেকে আসবে সিংহের বাচ্চা, সুন্দরবন থেকে ধরে আনা হবে 'রয়েল বেঙ্গল টাইগার', নেপাল থেকে আনা হবে বাইসন, আসাম থেকে গণ্ডার, সবই ত আসবে কিন্তু প্রশ্ন ওঠে পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ জানোয়ার মনুষ্য নামক প্রাণীটি থাকবে কিনা—ওটা না থাকলে ত চিড়িয়াখানা একরকম অসম্পূর্ণাঙ্গ থেকে যাবে। ১৮৮৩ সালের ৬ই আগষ্টের স্টেট্‌সম্যান পত্রিকার খবর—মডেল হিসাবে দেখানর জন্য ধরে আনা হয়েছিল কয়েকটি মানুষকে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ থেকে চিড়িয়াখানায়।

লবণ হ্রদের ইতিকথা

আলিপুরের চিড়িয়াখানায় রক্ষিত আন্দামান ও নিকোবারিজদের দেখবার জন্য লোক আসত দলে দলে—তাদের রাখা হয়েছিল গণ্ডারের আস্তানার পাশে। দুটি প্রাণীর মধ্যে কোন সাদৃশ্য ছিল কিনা জানা নেই তবে নবাগতদের বিচিত্র বেশভূষায় আকৃষ্ট হয়ে সকাল সন্ধ্যা লোকের আনাগোনার বিশ্রাম ছিল না। বাঁদরদের যেমন কসরৎ শেখানো হয়—খাঁচার ময়না টিয়াকে যেমন বুলি শেখান হয় ঠিক তেমনি ভাবেই ওদের ইংরাজী ভাষার তালিম দেওয়া হতে লাগল—আশ্চর্য্যের বিষয় সমুদ্রদ্বীপবাসীদের যত কথা শেখান হয়েছিল তার মধ্যে দুটো কথা ওরা নির্ভুলভাবে বলতে পারত—Good Morning আর Two rupees please। ওদের টাকার অঙ্কটা কে শিখিয়েছিল লেখা নেই কারণ তখন ২ টাকায় কলকাতার আশে পাশে এক কাঠা জমি পাওয়া যেত। কলকাতায় বাস করবার ওদের কোন ইচ্ছে ছিল কিনা জানা নেই। লবণহ্রদের প্রস্তাবিত চিড়িয়াখানায় উপরে উল্লিখিত কোন দর্শনীয় জিনিষের ব্যবস্থা করা হবে কিনা সেটা বিবেচনাধীন আছে।

পাখীর খাঁচা—হরিণের খাঁচা, খরগোসের খাঁচা সবই ভরে উঠবে। পৃথিবীর সব প্রান্ত থেকে আনা হবে রঙ বেরঙা পাখী আর নানা রকমের হরিণ আর খরগোস।

সবচেয়ে আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে আমাদের কেষ্টপুরের খাল—সেটার দিকে তাকিয়ে এখন সকলে নাক সিটকায়—পাশ দিয়ে যেতে দুর্গন্ধের জন্য নাকে কাপড় দেয়; লবণহ্রদের বাসিন্দাদের কাছে একটা আতঙ্কের প্রতীক। ময়লাজলের নালা—চোর ডাকাতের সদর রাস্তা। প্রস্তাবিত পরিকল্পনায় আছে এই অপ্রশস্ত খালটিকে গভীর করে উপযুক্ত করে তোলা হবে নৌবহরের আনাগোনা ও ষ্টিমার লঞ্চের যাতায়াতের জন্য। গঙ্গার সঙ্গে যুক্ত করা হবে, আরও বিস্তৃতি নিয়ে যোগাযোগ সাধিত হবে বর্তমান বাংলাদেশের নদীর সঙ্গে। প্রতিবেশী এই দুই নদীমাতৃক দেশের মধ্যে সম্পর্ক আরও নিবিড় হয়ে উঠবে। বাণিজ্য সম্ভার নিয়ে দুই দেশের মধ্যে যাতায়াত চালু হবে—দেখতে পাওয়া যাবে পাল

তুলে দিয়ে বাঙ্গাল মাঝি ভাটিয়ালী গান গাইতে গাইতে মনের সুখে চলেছে তার বেসাতি নিয়ে কলকাতার হাটে বিকোতে। আবার পশ্চিমবঙ্গের পসারী চলেছে তার পসরা নিয়ে ব্যবসা করতে বাংলাদেশের হাটে বাজারে। এই খালের মধ্যে দিয়ে ছুটে চলেছে বাঁশী বাজিয়ে ছোট ছোট লঞ্চগুলি। হয়ত এখানেই সূচিত হবে এক নতুন অধ্যায়ের। বাংলার গৌরব নদীপথে, একদা যা ছিল বিশ্ববিশ্রুত আবার তা দেখা দেবে লবণহ্রদের সংলগ্ন এই খালের সুপরিকল্পিত রূপায়ণের মধ্যে দিয়ে। কবি হয়ত আবার গাইবেন—

"হাজার বাণিজ্য নায়,
সাগর বহিয়া যায়"

বাংলার ফুল ফুটে আছে রাস্তার দুই পাশের বাড়ীর অলিন্দে, ঘাসের ওপর ফুলের আস্তরণ—শরতের কাশফুলের হিল্লোল, দখিনা হাওয়া, স্থির ধীর মৌনব্রতী সন্ধ্যার আবহাওয়া, যুঁই শেফালীর গন্ধে আকুল বকুল ফুল নীরবে ঝড়ে পড়েছে সুনিবিড় ছায়াতলে। বৌগন-ভিলা আর মাধবীঝাড় হাতছানি দিয়ে আহ্বান জানাচ্ছে চলতি পথের পথিকদের। টগর, করবী, অতসী, অপরাজিতা আলো করে রেখেছে বাড়ীর অলিন্দ, বাড়ীর চাতাল। দোপাটি চন্দনের কৌটা ছিটিয়ে পড়েছে ফুলের বাগানে। কেতকী, কনকচাঁপা, কাঠ-গোলাপ আর রজনীগন্ধার সঙ্গে রয়েছে বেলফুল আর কনকচাঁপা। কানন সভার মানী সদস্যরা মিলে জাঁকিয়ে বসেছে—আলো ছড়িয়ে দিয়েছে চারদিকে। বালুর মাঠে এই অগণিত ফুলের রাজ্য কলকাতার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে। তাক লাগায় পথিকদের। কলকাতায় ছিল পেরিন সাহেবের বাগান—আরও ধনী মানীদের বাগান, যার থেকে নাম হয়েছে বাগবাজার। এখানে অষ্টাদশ শতাব্দীতে সাহেব মেমরা হাত ধরাধরি করে সান্ধ্যভ্রমণ উপভোগ করত। আমাদের লবণহ্রদের ফুল-বাগিচায় ম্যাক্সি, মিনি পরিহিতা মেয়েরা উঠতি বয়সের ভাবালু ছেলেদের হাত ধরে ঘুরে বেড়াবে।

কলকাতার বাল্যলীলায় দেখা যায় যে কত অবজ্ঞা কত অবহেলা

পেয়েছে দেশের কাছে বিদেশের কাছে। ১৮৮৬ সালের ১৪ই আগষ্টের ষ্টেট্‌সম্যান পত্রিকা খুললে দেখা যাবে যে স্যার জন স্ট্যাচি আর লর্ড টাউনসণ্ডের মধ্যে চলছে কলমের লড়াই। স্ট্যাচির মতে কলকাতা এক সুন্দর শহরে পরিণত হতে চলেছে অতি দ্রুত গতিতে। তিনি মুগ্ধ হয়েছেন পার্ক ষ্ট্রীট আর চৌরঙ্গী এলাকার দ্রুত উন্নতি দেখে—আর টাউনসেণ্ড বলেছেন যে কলকাতার মত এত খারাপ জায়গা ভূভারতে নেই। পায়ের নীচে মাটি সব সময় স্যাঁৎসেঁতে—সন্ধ্যার আকাশ ভরে যায় মশকের গুঞ্জনে—দিনের পরিবেশে থাকে মাছির ভনভনানি—না আছে কোন মনোহর দৃশ্য, না আছে কোন মনোরম পরিবেশ। কোন দিকে না আছে গগনচুম্বি পাহাড়—না আছে কোন দূরপ্রসারী পর্ব্বত শ্রেণী। ইংরেজরা কলকাতাকে দেখেছে বাণিজ্যের মাটি রূপে—সমস্ত দেশের রক্ত চুষে তোলবার জন্য। কত দুর্নাম এই কলকাতার ছড়িয়ে দিয়েছে দেশে বিদেশে। কিন্তু এই কলকাতা আঁকড়ে রাখতে প্রাণ দিয়েছে কাতারে কাতারে—খুন দিয়েছে, জান দিয়েছে হাজার হাজার, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বরে মরেছে শতে শতে। তবু কামড়ে রয়েছে কলকাতার মাটি।

কলকাতার সৃষ্টি হয়েছে পুকুর ভরাট করে আর লবণহ্রদের জন্ম হয়েছে ভেড়ি ভরাট করে। কলকাতায় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেও ছিল প্রায় হাজার খানেক পুকুর। অঞ্চলের নাম হতো পুকুর দিয়ে, শ্যামপুকুর, মনোহরপুকুর, চুনাপুকুর। আকারটা বড় হলে বলা হতো দীঘি, জলা-ডোবা, খানাখন্দ ছিল অজস্র। দুটোর মধ্যে পার্থক্য হলো কলকাতার পুকুর ভরাট হয়েছে আবর্জনার স্তূপ দিয়ে আর লবণ-হ্রদের ভেড়ি ভরাট হয়েছে পবিত্র গঙ্গার পলিমাটি ও গঙ্গাজল দিয়ে—যে গঙ্গাজল অষ্টাদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণবচরণ শেঠ বিক্রী করতেন শীল-করা বোতলে করে—দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে পণ্ডিত মদনমোহন মালবিয়া সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন বড় বড় কলসীতে লণ্ডনে ভয়াবহ পরধর্মের হাত থেকে স্বধর্ম বজায় রাখতে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভেড়ির কথা

বিদেশীরা দেখেছে এই কলকাতাকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ঘাঁটি রূপে। সকলেই কলকাতাকে গালি গালাজ দেয় কিন্তু ঝেটিয়ে তাড়িয়ে দিলেও আবার গুটি গুটি চলে আসে কলকাতায়। সেপাইরা পেটের দায়ে আসত দলে দলে—এখনও আসে হাজারে হাজারে কিন্তু গালি দিতে কেউ পেছপাও নয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর কলকাতা :

"মারী মড়ক আছে, বন জঙ্গল আছে। জঙ্গলে বাঘ ভালুক আছে। জলে বিষ আছে, ডাঙায় লোভ লালসার ছোবল। তবু কলকাতা থেমে নেই। বেড়ে চলেছে তরতরিয়ে"। (পুরানো কলকাতার কথাচিত্র—পূর্ণেন্দু পত্রী।)

তরতরিয়ে বেড়ে চলেছে বিংশ শতাব্দীর লবণ হ্রদও। মশা-মাছি আছে—পূর্ব সীমানার বন জঙ্গল আছে। জঙ্গলে শেয়াল বনবিড়াল আছে, জলে অস্বাভাবিক ভাবে লৌহচূর্ণ আছে। ডাঙায় চোরছ্যাচোরের অবাধ আনাগোনা আছে। রাতে মশা, দিনে মোষ, খালের ওপারে ডাকাত এপারে সর্পকুল—তবু লবণ হ্রদের অগ্রগতি রয়েছে অব্যাহত।

লবণ হ্রদের ইতিবৃত্তের মালমসলা যোগাড় করতে হয় ভেড়ির জলে সাঁতার দিয়ে অথবা ভেড়ির জলে ডুব মেরে। লবণ হ্রদের ইতিবৃত্তের সঙ্গে মিশে আছে ভেড়ির ইতিহাস—ভেড়ি দখলের ইতিহাস আর ভেড়ির মাছের ইতিহাস। ভেড়ির মধ্যে ছিল অজস্র মাছ—কত রকমের কত রঙবেরঙের, তবে সাধারণত চাষ হতো রুইকাতলা তাদের ডিম নিয়ে আসত জেলেরা। ১ কেজি ডিমের দাম ছিল ২০০/২৫০ টাকা, মাছের চাষে সার দেওয়া হত গোবর আর খইল—যেমন ছিলো মাছের বাহার, তেমনি ছিলো মাছ ধরার জালের বাহার—খেপলা, কোমর, পাটা, চরপাটা ইত্যাদি। অবশ্য ঐসব বাহারে জালের

ব্যবহার ছিল সুন্দরবনের নদনদী ও তার উপকূলবর্ত্তী মিষ্টি জলে। প্রকৃতির অপূর্ব লীলাখেলা—ফুঁসিছে গর্জ্জিছে নিত্য—খলখল ছলভরা লবণাম্বুরাশি পানের অযোগ্য। বিশাল বারিধির মধ্যে মানুষ তৃষ্ণার্ত হয়ে একবিন্দু জল পান না করতে পেরে ধুঁকতে ধুঁকতে সমুদ্রের কোলে মৃত্যুবরণ করে ঢলে পড়ে। প্রকৃতি তাই নিজের সৃষ্টিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য মিষ্টি জলে দিয়েছেন অমোঘ শক্তি। যার ফলে সে সমুদ্রের তরঙ্গমালাকে দূরে ঠেলে দেয় ধরিত্রীর কোল থেকে, তাই মানুষ সমুদ্র-তীরেও বাস করে অঢেল মিষ্টি জল খেয়ে তৃষ্ণা মেটায়—মিষ্টি জলে মাছ চাষ করে। এইসব মাছের মধ্যে চিংড়ি মাছই হলো মাছের রাজা। লবণ হ্রদের ভেড়িতেও তাই চাষ হতো চিংড়ি মাছের—বিকোতো চড়া দামে। তপসে মাছ ছিলো শাসকদের প্রিয়, তপসে মাছের চাষ হতো। আর চাষ হতো মাছের রাজা রুই, তার ছোট ভাই মাথা মোটা পেট পাতলা কাতলা আর তার সঙ্গী মৃগেলের—এরা সংখ্যায় হতো প্রচুর। তবে এর আদর ছিলো না বিশেষ, তাই দামও ছিল রুইএর তুলনায় অনেক কম। মাঝে মাঝে দেখা দিত মহাশোল—দেখতে বিরাট বলে একে রাজা মাছ বলে।

মাছের ডিম থেকে হলো পোনা—আর পোনা বেড়ে চল্ল ধাপে ধাপে, শৈশব পেরিয়ে যেই এরা যৌবনে পা দিল, মালিকদেরও চিন্তা ধরে কি করে একে রক্ষণাবেক্ষণ করা যায়। এদের দেখাশুনা করার জন্য চাই প্রচুর লোক। তাছাড়া দুই ভেড়ির মধ্যে সীমানা এত সূক্ষ্ম থাকে যে, একটা লোক কোন মতে পায়ে হেঁটে যেতে পারে। সম্ভাবনা থাকে বাঁধে ফাটল ধরবার, সম্ভাবনা থাকে বাঁধ ফেটে এক ভেড়ির মাছ অন্য ভেড়িতে যাওয়ার। তাই মালিকেরা সদা শঙ্কিত। প্রয়োজন হলো আলাজনের। এদের কাজ হলো সারা দিনরাত ভেড়ির অতন্দ্র পাহারায় থাকা। ভেড়ির এককোণে জলের মধ্যে খুঁটি পুতে একখানা দোচালা বা চার চালা ঘর তৈরী হয়, তার মধ্যেই রাতের বেলায় আলাজন থাকে পাহারায়। ওপরে উন্মুক্ত আকাশ চাঁদের আলোয় ভরা, তারার ঝিকি-

ঝিঝি—আর নীচে মাছের নিস্তব্ধ বিচরণ, মাঝে মাঝে মাছের উল্লাসে জলের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ। কান পেতে বসে থাকে আলাজন মৎস্য চোরের পদধ্বনি শোনবার জন্য—আর এক পদধ্বনির জন্যও কান পেতে থাকে। সেটি প্রায় নিঃশব্দ কোমল পায়ের শব্দ—মাঝরাতের আগে সে আসে না, সে পদধ্বনির মালিকানী হলো ভেড়ির মেয়েজন। জেলেজনকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে অনেকখানি রাস্তা তাকে চুপিসাড়ে আসতে হয়—তবু সে আসে—সোমত্ত মেয়ে বৃদ্ধের হাতে পড়ে নাজেহাল। তাই আলাজনের মত্ত যৌবনের হাতে নিজের লালসাকে চরিতার্থ করে নিমীলিত চোখে।

এ কাহিনী শুধু একক নয়—মেয়েজনেরা যখনই কজের ফাঁকে দল পাকিয়ে বসে, তখনই চলে রসসিঞ্চিত আলোচনা, টিপ্পনি সমেত সমালোচনা। ছোট পরেশ ভেড়ি, আর বড় পরেশ ভেড়ি ছিল পাশা-পাশি, সব সময় লেগে থাকত বিবাদ বিসম্বাদ। ওর অল্প একটু দূরেই ছিল চিন্তামনি সিংএর ভেড়ি। ছোট পরেশ ভেড়ির আলাজন রাম-চরণের বয়স হয়েছে, ষাটের কোঠায় পা দিয়েছে, কিন্তু যৌবনের জল-তরঙ্গে তখনও ভাঁটা পড়েনি। বৌটা সেই কবে, ওর বয়স তিনের কোঠায় থাকতেই অক্কা পেয়েছে ওলাওঠায়। তারপরে আরোও তিন দশক কেটে গেছে। অপূর্ণ অভিলাসের খোঁচায় সবসময় ছট্‌ফট্‌ করে। ভেড়ির চাকরী করে, দু-চারটে মাছ হাতবদল করে বেশ কিছু পয়সাও জমেছে। মহিষবাথানের হরিপদ মাঝির মেয়ে ফুট্‌কিকে শেষ পর্য্যন্ত নগদ সাত কুড়ি টাকা, দুখানা করগেটের টিন দিয়ে কিনে নিয়ে এল। কিন্তু মুসকিলে পড়ে গেল ভেড়ির মালিককে নিয়ে। কিছুতেই রাতের পাহারায় নিযুক্ত রামচরণকে ফুটকির সাথে থাকতে দেবে না। মালিকের মতে পাহারা ও স্ত্রী সহবাস একসঙ্গে চলে না। যাই হোক অনেক অনুনয় বিনয়ের পরে, বেশ প্রতিশ্রুতি মুচলেকা দেওয়ার পরে মালিক রাজী হলো। রামচরণ আহ্লাদে আটখানা। রাতের বেলায় দুজনে একসঙ্গে পাহারা দেয়, আবার কাজের ফাঁকে ফাঁকে রসালাপ ও কামা-লাপ দুটোই চলে, রাতগুলো চলছিলো রসসাগরে হাবুডুবু খেতে খেতে।

কিন্তু বেশীদিন এই সুখ রামচরণের কপালে সইল না, প্রেম টিকলো না। বাদ সাধলো, ছোট পরেশ ভেড়ি আর বড় পরেশ ভেড়ির জোয়ান মদমত্ত আলাজন। ফুটকির অবশ্য রামচরণকে মোটেই ভালো লাগতো না। প্রথম প্রথম কয়েকদিন কেটে গেছে নতুনের আস্বাদে, কিছুদিন পরেই এসে গেলো একঘেয়েমির বিবর্ণতা। এই বিস্বাদের তাড়নায় ফুটকি যখন পিট্ পিট্ করে তাকাচ্ছিলো এদিক ওদিক নতুনের অন্বেষণে ফুটকির কপাল তখন গেলো খুলে। বৃদ্ধের পরিচর্য্যায় বিরক্ত হয়ে ও বিগত যৌবনের সাহচর্যে সে অতিষ্ঠ, তখন ছুটে গেলো তার নতুন মনের মানুষ। কিন্তু একটা নয় তুটো—জেলেজনের চোখ এড়িয়ে, রামচরণের নাগালের বাইরে। তুজনেই সুযোগ বুঝে প্রেম নিবেদন করতো ফুটকির যৌবনের বেদীমূলে। একদিকে মদন ঢালি—নাতুস নুতুস্ চেহারা, ফুলো ফুলো গাল তুটোর চাপে পড়ে চোখতুটো একরকম চাপা পড়ে গেছে, সেই কুতকুতে চোখে তাকিয়ে থাকতো ফুটকির দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে। ফুটকি মজা পেতো মদন ঢালির এই নির্বাক আবেদনের জন্যে, নিজেই এগিয়ে যেতো মদনের নাগালের মধ্যে, তবু যেন সে সভয়ে ও সমীহ করে অতি সন্তর্পনে ফুটকির ঘনিষ্ট হতো। অন্যদিকে নবীন বাড়ুই ছিলো সবাক। মদমত্ত যৌবনের নেশায় ফুটকির ওপর বিনা নোটিশে ঝাঁপিয়ে পড়তো, তাকে পিষে ফেলতো। বাঁধভাঙ্গা স্রোতের বেগে ফুটকিকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতো সুখের সপ্তম স্বর্গে। মদন ঢালিকে ফুটকি ভালবাসতো, কিন্তু তাকে ভালো লাগতো না, নবীন বাড়ুইকে ফুটকির খুব ভালো লাগতো, কিন্তু তাকে ভালো বাসতো না। মদন-নবীন-ফুটকির প্রেম পর্ব যখন জমজমাট, তখন চিন্তামণির ভেড়ির কাছে ফুটকি ধরা পড়লো রামচরণের কাছে একেবারে বেসামাল অবস্থায় হাতেনাতে। মেয়েজন আর জেলেজনের মধ্যে হৈ-হৈ-রৈ-রৈ পড়ে গেলো—সভা বসলো ফুটকির বিচারের—রায় হলো লবণ হ্রদ থেকে ফুটকির নির্বাসনের। ফুটকির নির্বাসন হলো, কিন্তু ফুটকির ফুটন্ত যৌবন নির্বাসিত হলো না। ভেড়ির মালিক পড়ন্ত

ভেড়ির কথা

জমিদারের ফাটলধরা তেতলা বাড়ীর নীচের তলার খুপরিতে আশ্রয় পেলো বাড়বাড়ন্ত যৌবনের মালিক ফুটকি। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের ইতিহাস ঘাটলে এরকম ঘটনা হামেশাই পাওয়া যাবে।

লবণহ্রদের ইতিবৃত্তর খোঁজে জাতীয় গ্রন্থাগারে উপস্থিত হলাম। সহকারী এক কর্মচারীর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করলাম। ভদ্রলোক সবিনয়ে আমাকে সাহায্য করার জন্যে এগিয়ে এলেন—নিয়ে এলেন CMDA-এর প্রকাশিত ৩।৪ খানা প্যাম্ফলেট—সেগুলোর জন্যে ধন্যবাদ দিয়ে আমি বল্লাম যে আমার কৌতূহল লবণহ্রদের অতীত ইতিহাসে—ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে হাতখানা লম্বা করে বল্লেন, সেটার জন্য ত সাতহাত জলের তলায় খুঁজতে হবে। সাতহাত নয়, হাত তিনেক জলের তলায় নেমে খুঁজতে গিয়ে মাথায় লাগলো বিরাট এক ঠোক্কর, হাত দিয়ে টের পেলাম যে পেটমোটা কতগুলি জালা বসানো আছে জলের মধ্যে—সেই জালার আশেপাশে ঝাঁকে ঝাঁকে মাছের দল নেশা-খোরের মতো অনবরত জালার গায়ে ঠোকরাচ্ছে। পরে খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম যে জালার মধ্যে রয়েছে চোলাই মদ, মুখগুলো ঢাকা রয়েছে কাপড়ের টুকরো আর সিমেন্টের প্রলেপ দিয়ে। বাগের ভেড়ির এক কিনারা থেকে আর এক কিনারা পর্য্যন্ত সাজানো রয়েছে থরে থরে—একই সঙ্গে এত অমৃতের ভাণ্ডার মজুত—যদি একবার দেবতাদের নজরে পড়ে, তবে তো আর রক্ষা নেই। দেব দানবের লড়াই বেঁধে যেতো, নারায়ণকে আবার নেমে আসতে হতো মোহিনী-বেশে, দেবতাদের মান বাঁচাতে আর দানবদের সঙ্গে প্রতারণা করতে। সব দেবতারা টের না পেলেও মাধব পোল্লের শিবঠাকুরের নজর এড়াতে পারেনি। তাই পোল্লের মন্দিরে দুএরই চলতি ছিল—মদও চলতো আবার গাঁজাও চলতো। মাধব পোল্লে গাঁজার ছিলিমে টান দিতে দিতে অর্দ্ধনিমীলিত চোখে ভক্তদের আশীর্ব্বাদ করতেন আর গাঁজার প্রসাদ বিতরণ করতেন। আর তস্য পুত্র রাজকৃষ্ণ পোল্লে বুঁদ হয়ে থাকতো অমৃতের ভাণ্ডে।

তৃতীয় অধ্যায়

পশু-পক্ষীর কথা

পাখীর আসর

লবণহ্রদে পাখী ছিল নানা রঙবেরঙের, নানা ধরনের। কোনটার ঠোঁট লম্বা, কোনটার চ্যাপটা, কোনটার ভোঁতা, আবার কোনটার ছুঁচলো, কারোও ঠোঁটের ওপর চিহ্নিত করা, কারোও বা রঙ লাল টুকটুকে। নামেরই বা কি বাহার। অবশ্য অধিকাংশ পাখীর স্থায়ী বাস ছিলো সুন্দরবনের সমুদ্র উপকূলে। এর মধ্যে সচরাচর বালিহাঁসই বেশী দেখা যেতো—এরা ঝাঁকে ঝাঁকে আসতো যদিও বলাকার মতো সৌন্দর্য্য এদের ছিল না। ওদের দেখে কবির মনে জেগে উঠতো না কাব্যগাঁথা, তাদের উদ্দেশ্যে উছলে পড়েনি কবিতার উৎস, যেমন জেগে উঠেছিল কবির অন্তর হতে বলাকার উদ্দেশ্যে—

হে হংসবলাকা

ঝঞ্ঝা মদরসে মত্ত তোমাদের পাখা

রাশি রাশি আনন্দের অট্টহাসে

বিস্ময়ের জাগরণ তরঙ্গিয়া চলল

আকাশে।

বকের ঝাঁক দেখে বিশ্বকবি রচনা করলেন কবিতা। কাব্য বিলাসীদের কাছে বিস্ময় জাগালো কবিতা। কোঁচবক বা ব্যাধদ্বারা ক্রৌঞ্চ নিহনে ক্রৌঞ্চীর বিরহে ব্যথিত হয়ে বাল্মীকির মুখ থেকে স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে বেরিয়ে এসেছিল বিশ্বের প্রথম অনুষ্টুপ ছন্দ কিন্তু লবণহ্রদের বালিহাঁসের ঝাঁক দেখে জেলেজন আর মেয়েজনের মুখ ভরে যেতো লালায়। জেলেরা গুলতি দিয়ে বালিহাঁস মেরে দিব্যি পিক্‌নিক্ চালাতো ভেড়ির আলের কোণায় বসে। আলাজনও ভাগ পেতো মেয়েজনের পেলব হাতের রান্না বালিহাঁসের মাংসতে। আর পোল্লের মন্দিরের পিছনে বালিহাঁসের মাংস সহযোগে পানপাত্র নিঃশেষ

হয়ে যেতো মুহুর্মুহু।

মদনটাবা পাখী মাঝে মাঝে এসে বসতো ঝোপের পাশে অপেক্ষা করতো প্রিয়ার আগমনের—মদনার বেশভূষা ছিল অনেকটা মদনমোহনের মতোই, শুধু বাঁশরীর পরিবর্তে ছিল ক্ষুরধার চঞ্চু—তাই দিয়ে খেলা করতে করতে প্রিয়তমার মন ভুলাতো—নিভৃতে চলতো আলাপন :—

"ঘন চঞ্চু চুম্বনের অবসান কালে
নিভৃতি করিতেছিল কুজন গুঞ্জন।"

মাঝে মাঝে যখন কোন দলহারা হংস বলাকা অর্দ্ধনিমীলিত চোখে চুপ করে বসে থাকতো, মনে হতো লবণহ্রদের জলাভূমিতে অনাগত ভবিষ্যতের চিন্তায় সে বিভোর—লবণহ্রদের পট পরিবর্তনের ফলে অনায়াস লব্ধ আহার বিহার থেকে বঞ্চিত হবার চিন্তায় বিভোর।

আরও কতরকমের পাখী ছিল। ঢ়াটাং, কুকড়ো বাটা, গাড়াপোলা এরা সব আসতো ঋতুপরিবর্তনের সঙ্গে—এদের দেখা যেতো বসন্ত আগমনের দূতরূপে। লবণহ্রদ এদের কূজনে গুঞ্জনে ভরে উঠতো—যেমন ভরে উঠতো ইংরেজ আমলে সিমলা আর দার্জিলিং গ্রীষ্মের আবির্ভাবে।

দেখা দিত বাঁশকুরাল, হাজির হতো করমকালী, মানিকগয়াল, শ্যামখোল, মাঝে মাঝে উদয় হতো নানা রকমের বাজপাখী—ভীমবাজ, তুধবাজ আর রক্তবাজ। এর মধ্যে ভীমবাজ ছিল পাখীর রাজা। যেমন তার গুরুগম্ভীর আওয়াজ, তেমনই তার ঝাপটা মারার ধ্বনি, যা আতঙ্ক সৃষ্টি করতো পাখীর রাজ্যে। এর শিকার ছিল অব্যর্থ—বহুদূর থেকে ভেড়ির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ছোঁ মেরে মাছ নিয়ে নিশ্চিন্ত আরামে গাছের ডালে বসে বাঘ, কুমীর ও সাপের আড্ডায় ভোজনক্রিয়া সম্পন্ন করতো।

বাঘ, কুমীর ও সাপের আড্ডা

অষ্টাদশ শতাব্দীর কলকাতা—"বনের গায়ে বন। জঙ্গলের ঘাড়ে জঙ্গল, পচা পাতার গন্ধ। বুনো পাখীর কলকলানি। দিনে শূয়োরের

হানা, ঝোপে ঝাড়ে সাপ খোপের শিষ। রাতে বাঘের গর্জন, ডাকাতের উল্লাস। প্রতিদিন প্রতিক্ষণ প্রাণকে হাতের মুঠায় নিয়ে বাঁচা।"

এদিকে ওদিকে ধানক্ষেত। ক্ষেতে খড়ির বন আর হোগলার ঝাড়। বন পেরুলে এঁদো ডোবা। ডোবা ছাড়িয়ে মস্ত খানা খন্দ। তাতে যত জল, তত বিষ।

"একটু বনের পথ ধরে হাঁটলে পায়ে ঠেকে মরা মানুষের হাড়। একটু বেশী রাতে বাড়ী ফিরলে প্রাণ যায় ডাকাতের হাতে। রাত আরো গভীর হলে নরবলির উন্মত্ত চিৎকার ওঠে দূরের কোন মন্দিরে। ডাঙ্গায় বাঘ, জলে কুমীর আর জঙ্গলে ডাকাত" এই নিয়ে আদ্যি-কালের কলকাতা। (পুরানো কলকাতার কথাচিত্র—পূর্ণেন্দু পত্রী) এই আদ্যিকালের কলকাতার পূর্ব সীমানায় ছিল নোনা জলাশয়, আমাদের লবণহ্রদ—বর্তমান সল্টলেক সিটি।

সুন্দরবনের জঙ্গল পেরিয়ে মাঝে মাঝে বাঘ হানা দিত নররক্তের লোভে, গরু-ছাগলের কচি মাংসের আশায়, উন্মুক্ত আকাশের নীচে নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করতে বেরিয়ে আসে গহন অরণ্যের বাহু-পাশ ছিন্ন করে। পূর্ণচন্দ্রের সঙ্গে বাঘের একটা সাদৃশ্য আছে—হয়তো বাঘ খুঁজে পায় চাঁদের মধ্যে তার মুখের প্রতিবিম্ব, তাই হয়তো এত মিতালি। সুন্দরবনের সংলগ্ন অঞ্চলে বাঘে মানুষে লড়াই চলতো মাঝে মাঝেই। বাঘ যত শক্তির দেমাক দেখাক না কেন, যতই গর্জন প্রকম্পিত করুক না কেন, মানুষের বুদ্ধির কাছে, মানুষের হিংস্রতার কাছে বাঘ খুবই ছেলেমানুষ। বাঘ যেমন মানুষকে আক্রমণ করবার আগে তার গতিবিধি আর পারিপার্শ্বিক অবস্থা পুঙ্খানপুঙ্খরূপে পরিদর্শন করে, মানুষও যুগ যুগ ধরে বাঘের চরিত্র পর্য্যবেক্ষণ করে তার চরিত্রের দুর্বলতাগুলো জেনে নিয়েছে। বাঘ যে পথ দিয়ে তার দুর্ভেদ্য জঙ্গলের আস্তানা থেকে বেরিয়ে আসে শিকারের খোঁজে ঠিক সেই পথ দিয়েই সে ফিরে যায়। যদি প্রথম বার ব্যর্থ হয় তবে দ্বিতীয়বারও সেই একই পথে আবার আসে। ব্যাঘ্রশিকারী তাই ওৎ

পেতে অপেক্ষা করে বাঘের চলার পথে। গ্রামের লোকেরা দল বেঁধে বাঘ শিকারে বের হয়—কলপাতা পদ্ধতিতে চেষ্টা করে বাঘকে গুলি করে মারতে। বাঘের চলার পথে লুকিয়ে পেতে রাখে বাঁশের তেপায়ার ওপর গুলি ভরা বন্দুক, আর আড়াআড়ি ভাবে পেতে রাখে লম্বা কালোসুতা অন্যমনস্কভাবে চলার পথে বাঘের পায়ে জড়িয়ে যায় কালো সুতা; আর সুতার টানে বন্দুকের গুলি বেরিয়ে আসে, ঠিকমতো লাগলে বাঘ তাতে মারা যায়। বাঘের হাত থেকে বাঁচার জন্য মানুষ শুধু নিজের বুদ্ধির ওপরই নির্ভর করে না, আশ্রয় নেয় মানুষ ওঝার কাছে, আর শরণাপন্ন হয় দেবতা বনবিবির কাছে—ছেলের অসুখ হলে গৃহকর্ত্রী যেমন একদিকে ব্যবস্থা করে ডাক্তারের ইনজেকশনের, আবার অন্যদিকে মানত করে, পয়সা রাখে তুলসীতলায়—প্রার্থনা জানায় দেবীর চরণে মন্দির প্রাঙ্গণে।

লবণহ্রদের কখনও কখনও হাজির হতো কুমীরও। সমুদ্রের সঙ্গে যুক্ত নদ-নদীর পথ ধরে চলে আসতো লবণহ্রদের জলাশয়ে, তবে সে কচিৎ কদাচিৎ—হয়তো পথ ভুলে। বাঘের চেয়ে কুমীর শিকার অনেক সহজ। সমুদ্র উপকূলে যারা বাস করে তারা কুমীর শিকার করতে ব্যবহার করে একপ্রকার অস্ত্র—নাম চবক। এই অস্ত্রের আগায় হলুদ লাগিয়ে ছুঁড়ে মারে কুমীরের গায়ে—হলুদ বিষের মতো কাজ করে। কুমীর ঐ প্রখর অস্ত্রের আঘাতে ছটপট্ করে মারা যায়। কুমীর শিকার ধরবার আগে মৃতের মতো পড়ে ওত্ পেতে থাকে। কুমীরের চোখ দুটো মাথার ওপরে থাকায় শুধু চোখ দুটো জলের ওপর রেখে শিকার খোঁজে। সেই সময় 'চবক' মেরে তাকে ঘায়েল করা হয়। চবকের সঙ্গে বাঁধা থাকে একটি দড়ি—মরা কুমীরকে টেনে পাড়ে তোলবার জন্যে। কুমীর বাঁচে প্রায় ২০০ বছর—একসঙ্গে ডিম দেয় প্রায় ৫০ টা। বাবা মা দুজনেই ভাগাভাগি করে বাচ্চা খেয়ে ফেলে। তাই কুমীর একটু বড় হলেই জলের তলায় পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচায়। বাঘে-কুমীরে লড়াইতে কুমীরই সাধারণত জেতে। শোনা যায় ভেড়িতে

পাহারারত আলাজনকে আক্রমণ করতে লাফ দিল বাঘ—লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে জলে পড়লো। কুমীরের হাতে পড়ে শেষ হলো নিজের প্রাণ।

মাছ হলো, পাখী হলো, লবণহ্রদের আর এক আদিম অধিবাসী বাঘ হলো, কুমীর হলো, এবার আসুন সাপের কথা নিয়ে আলাপ করা যাক। লবণহ্রদের সাপ আমাদের অভিশাপ দিচ্ছে নিরন্তর। কলকাতার পূর্ব সীমানায় অবস্থিত এই নোনা জলাশয়ে তারা ছিল তাদের অবাধ স্বাধীনতা নিয়ে; ভেককুল পরিবৃত হয়ে। তাদের এই স্বাধীন রাজ্যে স্বামী-স্ত্রী-পুত্র-কন্যাসহ এক একটি সুখী পরিবার বাস করতো আপন আপন মর্য্যাদা নিয়ে, ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য ছিল ভেকবংশ—নৈশ ভ্রমণের জন্য ছিল শ্যামায়মান আস্তরণে ঢাকা উন্মুক্ত আকাশের তলে পায়ে-হাঁটা রাস্তা, জলাশয়ের কিনারায় সর্পিণীরা প্রসববেদনা এলেই চলে যেতো মেঠো ইঁদুরের গর্তে। নিরাপদে ডিম পাড়তো—লালন পালন করে বংশবৃদ্ধির আনন্দে মশগুল থাকতো। না ছিল পরিবার পরিকল্পনার অনুশাসন, না ছিল দুর্ভিক্ষের কালোছায়া।

এদের প্রধানতঃ দুভাগে ভাগ করা যায়—বিষহীন আর বিষাক্ত। সর্প-সমাজতন্ত্রে কোন জাত-বিচার নেই। তবে হাজার চেষ্টা করেও বিষহীনেরা অভিজাত সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাল দিয়ে উঠেত পারে না। কোন বিষধর সর্পিণী কখনো বিষহীন সর্পের সঙ্গে সহবাস করে না। বিষধর তার আপন আভিজাত্যের গরিমায় ডগমগ। হেলেদুলে চলে, রাগ দেখাতে হলেই ফণা তুলে ছোবল মারে, খিদে পেলেই ভেকের পিছনে ছোটে, ভেকও প্রাণ নিয়ে ছুটতে থাকে সাপের মুখ থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে, এক্ষেত্রে ভগবানের হয় ত্রিশঙ্কু অবস্থা। একদিকে ক্ষুধার্ত্ত সাপ ভগবানের চরণে আকুতি জানাচ্ছে—হে ভগবান, দেখো যেন আমার ক্ষুধার গ্রাসটি থেকে আমাকে বঞ্চিত করো না আর অন্যদিকে ভীত পলায়মান ভেকটি দেবাদিদেব মহাদেবের চরণে পেশ করছে তার আর্জি—'হে ভগবান, আমাকে বাঁচাও এই বিষধর সর্পের ছোবল থেকে।' ভগবান কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ়

হয়ে মাথা চুলকোতে থাকেন। এ ব্যাপারে ভগবানের খাস কামরায় ভক্তগণ বলতে পারবেন যে স্বর্গরাজ্যের সংবিধানের কোন্ ধারা প্রযোজ্য। আমাদের পক্ষে এর হদিশ করা সম্ভব নয় কারণ আমাদের কাছে ভগবান দূর-অস্ত।

বিষধর সর্পের মধ্যে আবার বর্ণ বিভাগ আছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন 'চাতুর্বর্ণং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ"। গুণ ও কর্মের ভিত্তিতে মনুষ্যসমাজে চারটি বর্ণের সৃষ্টি হয়েছে। সাপের বর্ণ বিভাগ হয়েছে তাদের বিষের পরিমাণ এবং ফণাব পরিধির ওপর। সেই হিসাবে সর্পকুলকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে—(১) চৌপাশা, (২) বোড়া, (৩) বীজজড়ী। চৌপাশা জাতের মধ্যে পড়ে—কেউটা, গোখুরা, আইরাজ আর কাপড়। কেউটা আবার হয়—কাল কেউটা, পদ্ম কেউটা, বাঁশবুনা কেউটা; গোখুবাকে ভাগ কবা যায়, কালী গোখুবা, খয়ে গোখুরা, হলদে গোখুরা আর পদ্ম গোখুরা; আইরাজের মধ্যে পড়ে,—দুধরাজ, পাতরাজ, ভীমরাজ, শঙ্খচূড় অথবা শঙ্খরাজ। শঙ্খরাজের বিষ সর্বাপেক্ষা সাংঘাতিক। বীজজোড় সর্প হলো—কালনাগিনী, রুদ্রকাল, মহাকাল আর উদয়কাল।

বিষহীনদের মধ্যে আসে, বোড়া, দাঁড়াল, ময়াল, গুইসাপ। বোড়া বংশে শঙ্খিনী দুমুখো বিষধর জাতের মধ্যে পড়ে—হরিণ বোড়া আর চন্দ্রবোড়া।

যতরকমের সাপের নাম এখানে লিখতে হলো, সে সবগুলোই লবণ-হ্রদকে তাদের জন্মভূমি বলে দাবী করতে পারে। তবে এদের মধ্যে বোড়া জাতীয় কিছু সাপ, যেমন হরিণবোড়া আর চন্দ্রবোড়া এরা সুন্দরবন থেকে লবণহ্রদে এসেছিল উপনিবেশ স্থাপনের মানসে, কিন্তু বেশীদিন এখানে ভালো লাগেনি। শক্ত মাটি আর গরম আবহাওয়া না হলে এদের শরীর টেকে না। তাই লবণহ্রদের জলো হাওয়া আর স্যাংসেঁতে পরিবেশে এরা বেশীদিন থাকতে পারে নি। এই বোড়া-জাতীয় সাপের অনেক গল্প শোনা যায় শ্রীলঙ্কার অধিবাসীদের কাছ থেকে। জঙ্গলের এক কাঠুরিয়া পরিশ্রান্ত হয়ে এক গাছের গুঁড়ির

ওপর আরাম করে বসে তামাক সেজে নিয়েছে তার হুকো কল্কেতে— তামাকু সেবনের পরে কল্কের আগুন গাছের গুড়ির ওপর ঢেলে যেই পরিষ্কার করতে যাবে—আর যায় কোথা—অমনি সমস্ত গুড়িটা আগুনের ছ্যাকায় নড়ে চড়ে উঠেছে। কাঠুরিয়া এক গাছের আড়াল থেকে দেখতে পেল যে গাছের গুড়িটা আর কিছুই নয়, এক বিশালাকায় বোড়া সাপ—এক গর্তের মধ্যে ছিল তার লেজ আর এক গর্তের মধ্যে ছিল তার ফণা, দেহটা রোদের মধ্যে এলিয়ে রোদ পোহাচ্ছিল—আগুনের ছ্যাঁকা সহ্য করতে না পেরে প্রতিবাদ করে উঠেছে। তাই বোড়ার ওই বিশাল দেহ নিয়ে লবণহ্রদের লোনা জলাশয়ে বেশী দিন থাকা সম্ভব হয় না। দুচার দিনের জন্যে হাওয়া বদল করে আবার সে সুন্দরবনের ডেরায় ফিরে যেতো।

নিবারণ বহুদিনের পুরানো জেলেজন—অনেকদিন ধরেই বড় পরেশ ভেড়িতে কাজ করেছে, পরে সর্দারের পদে উন্নীত হয়ে চলে আসে বাগের ভেড়িতে। ভেড়িতে সবরকমের লোকই তাকে ভালবাসে, শুধু আহ্লাদী ছাড়া—আহ্লাদী তার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। প্রথম পক্ষের ছেলে মাধবকে নিয়ে তার সঙ্গে সব সময় ঝগড়াঝাটি লেগে থাকে। মাধবের মুখে অরুচি ধরেছে মাছ খেতে খেতে। পাখীর মাংস তার প্রিয় খাদ্য। সে গুলতি নিয়ে চলেছে পাখী শিকারে। তখন ভরা দুপুর। কাঠ ফাটা রোদে পাখী তাক করতে গিয়ে এক অপূর্ব দৃশ্য দেখে সে 'থ' হয়ে গেলো। তার হাতের গুলতি হাতেই থেকে গেলো। অবাক বিস্ময়ে বিস্ফারিত চক্ষে চেয়ে থাকলো সামনের দিকে। এক ভুজঙ্গ আর ভুজঙ্গিনী বিরাট ফণা বিস্তার করে সৃষ্টির উল্লাসে উদ্দাম উন্মত্ত। সর্পিণী তার বিচিত্রিত দেহলতা দিয়ে সর্পের সর্বাঙ্গ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে জাপটে ধরে আছে—সর্পিণী নিঃশেষ করে দিচ্ছে নিজেকে সর্পের বিলম্বিত দেহের মধ্যে। বিষধর সর্প দম্পতির ফণা দিয়ে কি সে নিবিড় চুম্বন—কি সে গাঢ় আলিঙ্গন, সৃষ্টির উন্মাদনায় কামোন্মত্ত ভুজঙ্গ আর ভুজঙ্গিনীর উর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত দেহবল্লরী নির্গত রসে সিঞ্চিত যুগল সর্পদেহ

সূর্যালোকে ঝল্‌সে উঠ্‌ছে—সৃষ্টি রহস্যে অনভিজ্ঞ মাধবের জীবনে এই প্রথম অভিজ্ঞতা সৃষ্টিলীলার, তার সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপছিলো। হঠাৎ কি একটা সহজাত প্রবৃত্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে মাধব গুলতি ছুঁড়লো কামলীলায় লিপ্ত ভুজঙ্গের বিস্তৃত ফণাকে লক্ষ্য করে। অব্যর্থ শিকার—গুলতির পাথরের টুকরো ভেদ করে গেলো, ভুজঙ্গের প্রশস্ত ফণার মধ্যে দিয়ে। শিথিল হয়ে পড়লো আলিঙ্গন, পরিসমাপ্তি ঘটলো অসমাপ্ত কামলীলার। নিষ্প্রাণ দেহ লুটিয়ে পড়লো ধরিত্রীর বুকে। মর্মাহত ক্রুদ্ধ বিষধর ভুজঙ্গিণী প্রতিহিংসায় উন্মাদ হয়ে আছড়ে পড়লো বিরাট ফণা বিস্তার করে মাধবের দিকে ; প্রাণ ভয়ে ভীত আহত সর্পিণী বিষ ছুঁড়ে মারলো মাধবকে লক্ষ্য করে। কিন্তু মাধবের নাগাল পেল না সেই প্রক্ষিপ্ত বিষ—মাধব পরিত্রাণ পেলো সে যাত্রা। কিন্তু পরিত্রাণ পেলো না মাধবের বাপ নিবারণ। সেই রাত্রেই সর্পের দংশনে প্রাণ হারালো নিবারণ, আহ্লাদীর ক্রন্দনে প্রতিধ্বনিত হলো ভেড়ির আকাশ বাতাস। স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে কোথায় গেলো সর্পকুল, কোথায় বা সেই দুধরাজ আর কোথায়ই বা সে কালনাগিনী, কোথায় গেল সেই কাল গোখুরা আর কোথায় বা উধাও হলো সেই মহাকাল। সল্টলেকের 'সপ্তরশ্মির' দ্বারা পরিচালিত এক পিকনিকে হাজির হলাম বাদুতে। সেখানে সর্প বিশেষজ্ঞ দীপক মিত্রের প্রতিষ্ঠিত সর্প উদ্যান দেখতে গিয়েছিলাম। সাপের সে এক বিরাট মেলা। কত রকমের সাপ—কতভাবে তাদের রাখা হয়েছে, খাঁচার মধ্যে গুই সাপ, বাক্সের মধ্যে পদ্মগোখুড়ার বাচ্চা, উদয়কালের সন্তান সন্ততি প্রকৃতির কোলে উন্মুক্ত আকাশের তলে শীতের মিষ্টি রোদে গা এলিয়ে দিয়ে পড়ে আছে হলদে গোখুড়া আর রুদ্রকাল—গাছের ডালে জড়িয়ে আছে বাঁশ বুনো কেউটে, একটা পদ্মগোখুড়া শুয়ে আছে টানটান হয়ে। আমার বন্ধুবর ফটো বিশেষজ্ঞ শ্রীশ্যামদাস ব্যানার্জীর শখ হলো পদ্ম গোখুড়ার ফটো তুলবেন বিস্তারিত ফণা সমেত। আমরা সর্পটিকে জাগিয়ে তোলার জন্য কত দাপাদাপি, কত

হাততালি, কত বংশীধ্বনি করলাম, কিন্তু বিষধর সর্প নিস্পন্দ নিশ্চিন্ত আরামে লম্ববান হয়ে পড়ে থাকলো—দীপক মিত্রের বাড়ীর একটি মেয়ে এসে আমাদের ভুল ভাঙ্গিয়ে দিল। বললো সাপের কি কান আছে যে আপনারা শব্দ করে জাগাতে চেষ্টা করছেন। তখন মনে পড়ে গেলো যে সর্প তো 'চক্ষুশ্রবা', চোখ এড়িয়ে দেখে এবং চোখ দিয়েই শোনে। মেয়েটি তখন সাপের মুখোমুখি হয়ে ফণা বিস্তারের ভঙ্গিতে হাতটা নাড়ল। অমনি বিষধর ভুজঙ্গ বিরাট ফণা বিস্তার করে জেগে উঠলো। শ্রী ব্যানার্জী অমনি ক্লিক ক্লিক করে ফটোর মাধ্যমে ঐ সুন্দর দৃশ্য ধরে রেখে দিলেন।

সর্প উদ্যানে সংরক্ষিত সাপের একটি কামরায় গেলাম—সেখানে থরে থরে সাজানো রয়েছে অনেকগুলি বাক্স। বাক্সের চারপাশে ছোট ছোট ছিদ্রের মাধ্যমে হাওয়া যাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রশ্ন করে জানতে পারলাম যে ঐ বাক্সোগুলোর মধ্যে পুরে রাখা হয়েছে বিভিন্ন গোষ্ঠির এবং বিভিন্ন বয়সের সাপ, তারা রয়েছে শিক্ষানবিশী হিসাবে—বাক্সের মধ্যে রেখে তাদের ধাতস্থ করা হচ্চে নতুন জলবায়ু এবং নতুন জীবনের সঙ্গে মানিয়ে চলবার প্রস্তুতি হিসাবে। সাপের সংখ্যা হবে প্রায ৪/৫ শ। সাপগুলো কোথা থেকে আনা হয়েছে জানেন? ওর সবকটি লবণহ্রদ হতে। ভেড়ি ভরাট হলো। খানা খন্দ গঙ্গার পলিমাটির আস্তরণে নবীন বেশ ধারণ করলো, নিরাশ্রয় সর্প বংশ আশ্রয় পেলো সর্প উদ্যানে, মানুষের দাসত্ব বন্ধনে।

সর্প সম্বন্ধে আমাদের কতই না ভ্রান্ত ধারনা। সর্প উদ্যানের একপাশে পোষ্টারে লিখে রাখা হয়েছে সর্পের সত্য তথ্যগুলি।

১। সাপের মাথায় কোনও মণি থাকে না।

২। সাপ হলো চক্ষুশ্রবা, তার কোন কান নেই, চোখ দিয়ে সে দেখে, চোখ দিয়ে সে শোনে।

৩। কোনও শিকড় বা গাছ-গাছড়া দিয়ে সর্প দংশনে মৃত ব্যক্তির প্রাণ ফিরিয়ে আনা যায় না।

চতুর্থ অধ্যায়

গাজনের কথা

লবণ হ্রদের বর্তমান এই ব্লকের গা ঘেঁষে বয়ে চলেছে কেষ্টপুরের খাল। এই খালপাড়ে পোল্লেমশায়ের শিবমন্দিরকে কেন্দ্র করে গাজনের মেলা বসতো—দুদিন ধরে চলতো এই মেলা। অনেকদূর থেকে শোনা যেতো ঢাকের বাজনা—লোকের কোলাহল। আশেপাশের গ্রাম থেকে আসতো পসরা নিয়ে মেলায় বিকোতে—ক্রেতারও অভাব ছিল না। কলকাতার বনেদী বা উঠতি ধনীসম্প্রদায়ের মধ্যে গাজনের চলন ছিল। চড়ক পার্বণকে কেন্দ্র করে সর্বস্তরের মানুষ একত্র হতো। ছুতোর, গয়লা, গন্ধবেনে, কাঁসারী ও কাওরা গাজনের সন্ন্যাসী হয়ে বাবুদের সঙ্গে চড়কের দিনে এক গাড়িতে বসতে পারে—এমনকি সন্ন্যাসী কাওরাকে বাবুরা নমস্কার করে সম্মান দেন।

"ক্রমে দিন ঘমিয়ে এলো। আজ মূল সন্ন্যাসী কানে বিল্বপত্র গুঁজে হাতে একমুঠো বিল্বপত্র নিয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে বৈঠকখানায় উপস্থিত হলো। সে নিজে কাওরা হলেও আজ শিবত্ব পেয়েছে, সুতরাং বাবু তাকে নমস্কার করলেন। মূল সন্ন্যাসী এক পা কাদাশুদ্ধ ধোয়া ফরাসের উপর দিয়ে বাবুদের মাথায় আশীর্বাদী ফুল ছোঁয়ালেন—বাবু তটস্থ" (হুতোম প্যাঁচার নক্সা—কালীপ্রসন্ন সিংহ)। "মেলাতে সঙ সেজে আসত হাড়ীরা, ঢোলের সঙ্গতে, ভোলা ব্যোম, ভোলা বড় রঙিলা, ল্যাংটা ত্রিপুরারী। শিবে জটাধারী। ভোলার গলে দোলে হাড়ের মালা।" ভজনের সঙ্গে নাচ দেখিয়ে পয়সা আদায় করতো, মেলার এককোণে দেখা যেতো হরপার্বতী সেজে পয়সা আদায় করছে। গাজনের সন্ন্যাসী সব একত্র হয়েছে চড়ক পার্বণের প্রস্তুতির জন্যে।

শিবমন্দিরের সামনেই গাজনতলা—সকাল থেকেই লোকের সমাগম আরম্ভ হয়েছে। ঢাকের কুড়কুড় কুরাংএর সঙ্গে কাঁসি পাল্লা দিয়ে

ট্যাং ট্যাং বেজে চলেছে। মেলার এককোণে ডুলে বাগ্দীরা ছোট ছোট দুতিনটে কাড়ানাকাড়া নিয়ে তার ওপর হাত মক্স করছে—লোকের ভীড়ের সঙ্গে সঙ্গে তারাও এসে যোগ দিল ঢাকের সঙ্গে। মাধব পোল্লে নিজেই আজ মূল সন্ন্যাসীর অভিনয় করছে। দুচার জন সাঙ্গোপাঙ্গো নিয়ে শিবের কাছে মাথা চালা শুরু করে দিল। কোনো সন্ন্যাসী উপুড় হয়ে আবার কোন সন্ন্যাসী বা হাঁটু গেড়ে বসে মাথা ঘোরাচ্ছে। আর মূল সন্ন্যাসী শিবের মাথায় জল ছিটোচ্ছে। সময় তার নিজের গতিতে ছুটে চলেছে—সকাল গড়িয়ে দুপুর হতে চললো, তবু শিবের মাথায় ফুল আর পড়ে না—চারিদিকে কানাঘুষো চলতে লাগলো—ভক্তদের মুখে চোখে ভয়ের ছাপ দেখা দিল। হঠাৎ ভীড় ঠেলে এক বৃদ্ধ সন্ন্যাসী উপস্থিত হলো—তার চেহারা এবং সাজসজ্জা দেখলেই ভক্তি হয়। তারকেশ্বরে ছোপানো রঙীন আলখাল্লা—মাথায় পরিপাটি করে ফ্যাট্‌কা বাঁধা—মাজায় একটা নতুন গামছা বাঁধা—গামছার একদিক লম্বমান হয়ে প্রায় মাটি ছোঁয়া হয়ে ঝুলছে—গলায় রুদ্রাক্ষের মালা—বাজুতে মোটা দুগাছা করে বালা। পোল্লের হাত থেকে এক ঝাপটা মেরে গঙ্গাজলের ঘটি কেড়ে চীৎকার করে মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে শিবের মাথায় জল ঢালতে শুরু করলো। মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে গাজনের সন্ন্যাসীদের মাথাচালার পরিমাণ ও গতি বাড়তে লাগলো। নবাগত সন্ন্যাসীর মন্ত্রশক্তিতেই হোক আর তার বিশাল শরীরের দাপোটেই হোক, আর উপস্থিত ভক্তগনের গদগদ স্বরে প্রার্থনার জন্যেই হোক—শিবের মাথা থেকে একবোঝা বেলপাতা গড়িয়ে পড়লো—ভীড়ের মধ্যে সাড়া পড়ে গেলো, 'বলো ভদ্দেশ্বর শিবো' বলে চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গে জনসমষ্টির মধ্যে নাচন দেখা দিল। গাজন সন্ন্যাসীদের মধ্যে দুএকজন নাচতে নাচতে পাশের ভেড়ি থেকে কারও ফেলে দেওয়া কয়েকখানা বঁইচির ডাল কুড়িয়ে নিয়ে এল। গাঁজনতলায় আগেই পঁচিশ তিরিশ আঁটি বিচালি বিছানো ছিল। তার ওপর সন্ন্যাসীদের আনা কাঁটাডালগুলো বিছিয়ে দেওয়া হলো এবং কয়েকজন সন্ন্যাসী মিলে বাঁশের বাড়ি দিয়ে কাঁটাগুলোকে ভেঙ্গে দিলো।

তারপরে দুজন সন্ন্যাসী মোটা শক্ত গামছা দিয়ে আড়াআড়িভাবে দুদিকে টানা ধরে দাঁড়ালো। তখন গাজন সন্ন্যাসীরা একে একে কাঁটাঝাঁপ দিতে লাগলো। প্রতিটি ঝাঁপের সঙ্গে সঙ্গে ভক্তদের চীৎকার 'বলো ভদ্দেশ্বর শিবো' বলে। গাজন-সন্ন্যাসীদের পদধূলির দাম বেড়ে গেলো। ভীড়ের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে গেলো শিবের মাথার ফুলের জন্যে। সিকিটা, আধুলিটা ছিট্‌কে এসে ভীড় জমাতে লাগলো শিবের আশেপাশে। উপস্থিত ভক্তদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে গেলো ঝাঁপকাটার জন্য—অনেকের ধারণা যে ঐ ঝাঁপকাটা বিছানার নীচে রেখে দিলে কোন ছারপোকা থাকতে পারে না।

কাঁটাঝাঁপ শেষ হলে ভীড়টা সরে গিয়ে দাঁড়াল চড়কতলায়। আগের দিন ভেড়ি থেকে ধুমধামের সঙ্গে চড়কগাছ তোলা হয়েছে। তাতে মন্ত্রপুত মোট বাঁধা হয়েছে—এবং চড়কের মাথায় ঘি কলা বেঁধে চড়কের গাম্ভীর্য বাড়ানো হয়েছে। চড়কের ক্যাঁচ কোঁচ শব্দ শোনা গেল অনেকদূর থেকে—সন্ন্যাসীদের মধ্যে দুএকজন পিঠে বান ফুড়ে উঠে গেলো চড়কের উপর এবং চাকের বোলেব সঙ্গে চড়ক ঘুরতে লাগলো। ভক্তগণের উন্মত্ত চীৎকার, ঢাক কাঁসীর আওয়াজ কান ছাপিয়ে বর্ষশেষের আকাশ বাতাস ভরে দিল।

মেলার এককোণে এক সাধুবাবার আবির্ভাব হয়েছে। চারখানা বাঁশের ওপর একটা খড়ের চালা খাড়া হয়েছে। মাঝখানে একটা ধুনি জ্বালিয়ে জটাজুটধারী সাধুবাবা একখানা কুশাসনে ধ্যানে বসে আছেন—সামনে ধুনুচিতে বেশ কড়া করে ধুনো দিয়ে সমস্ত পরিবেশকে এক অপার্থিব রূপ দেওয়া হয়েছে। দুইপাশে দুই চেলা, সর্বাঙ্গে ভস্ম মাখা, কর্মব্যস্ততার মধ্যে উপস্থিত ভক্তদের কাছে বাবাজীর মহিমা কীর্ত্তনরত, তারই মধ্যে আনাটা সিকিটা যা পড়ছে সেগুলো যথাস্থানে রাখা হচ্ছে। চেলারা ঘোষণা করলো যে গভীর রাতে সাধুবাবার কাছে সকলের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে, তবে নরবলির অভাবে অন্তত একটি পাঁঠাবলি দিতে হবে। কারণ ভূকৈলাস থেকে আসবার পথে সমস্ত

চটিতে ঘি আর দালদা খেতে খেতে অগ্নিমান্দ্য দেখা দিয়েছে—একমাত্র মাংস ভক্ষণের দ্বারাই অরুচি আর অগ্নিমান্দ্য দূর হতে পারে। জমায়েৎ জনতার মধ্যে থেকে কে একজন টিপ্পনি ছুঁড়ে মারল, 'মাংস খেলে আবার অগ্নিমান্দ্য দূর হয় নাকি?' প্রধান চেলাটি তখন কয়েকখানা তক্তা জড়ো করে তার ওপর দাঁড়িয়ে রোমান কায়দায় বক্তৃতা শুরু করে দিল—"আপনারা সাধুবাবার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে অজ্ঞ, তাই টিপ্পনি কাটতে সাহস পাচ্ছেন—ঘি দালদা বেশী খেলে যে অগ্নিমান্দ্য হয় সেটা মহাভারত খুল্লেই দেখতে পাবেন। অগ্নিদেবতা বৈশ্বানর অগ্নিমান্দ্যে ভুগছিলেন—পাণ্ডবদের কাছে আবেদন জানালেন—মাংস আহুতির ব্যবস্থা করতে। রাজসূয় যজ্ঞের ঘৃতাহুতি বৎসরের পরে বৎসর গ্রহণ করতে করতে বৈশ্বানরের অগ্নিমান্দ্য হয়েছে—একমাত্র মাংসভক্ষণ দ্বারাই তাঁর রোগের প্রশমন হতে পারে। অগ্নিদেবতার অগ্নিমান্দ্য দূর করতে গিয়ে শুরু হলো খাণ্ডব দাহন, সেই খাণ্ডবদহনে ঝলসানো মাংস খেয়ে তবে বৈশ্বানরের অগ্নিমান্দ্য দূর হলো। তাই শাস্ত্রজ্ঞ সাধুবাবা সেই উদাহরণ অনুসরণ করে গভীর রাতে মাংস ভক্ষণের আয়োজন করছেন।" প্রধান চেলা এক নিঃশ্বাসে এতগুলি কথা বলে হাঁফাতে লাগলো। ভক্ত জনগণ বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে চেলা এবং সাধুবাবার জ্ঞানের পরিধি মাপতে চেষ্টা করলো। এবারে নবীন চেলাটির পালা, সে ঘোষণা করলে, যে, সাধুবাবা সিদ্ধপুরুষ, যদি কেউ জ্যান্ত পাঁঠা এনে দেয় আহুতির জন্যে, তবে পাঁঠাটির বলি হবার পরে সাধুবাবা কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তার নরজন্মের ব্যবস্থা করবেন। উপস্থিত জনগণের মধ্যে কেউ বা অবিশ্বাসের হাসি হাসলো। আর কারো বা সাধুবাবার অলৌকিক শক্তির প্রতি শ্রদ্ধায় প্রায় বিগলিত অবস্থা।

গভীর রাতে ফ্যালারাম তার আদরের নধর পাঁঠাটিকে এনে হাজির করলো। গভীর রাতে পাঁঠাবলির পরে উপস্থিত অতিভক্ত দু একজন এবং ফ্যালারাম ও তার ছেলেকে নিয়ে খুব ধুমধামের সঙ্গে মহোৎসব উদ্‌যাপিত হলো। ফ্যালারামের মুখে অরুচি দেখা দিল—চোখ ছলছল

করতে লাগলো—সতৃষ্ণ নয়নে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে—কখন আবার তার আদরের পাঁঠাটি পাবে সাধুবাবার মাহাত্ম্যে।

কিছুক্ষণ পরে ঘোষণা হলো যে সাধুবাবা এবারে ধ্যানে বসবেন—ঝাঁপ বন্ধ করে দেওয়া হলো—ধুনিতে খুব করে ধুনো দেওয়া হলো—চারদিকে ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেলো। ঘণ্টাখানেক বাদে ফ্যালারাম আর থাকতে না পেরে ঝাঁপের ফাঁকে উঁকি মেরে দেখে যে সব ফাঁকা—পেছনের ঝাঁপটি খোলা—কোথায় তার নধর পাঁঠাটি আর কোথায়ই বা তার ব্যা ব্যা শব্দ, শুধু তার অনিচ্ছা সত্ত্বে যা দু-এক টুকরো মাংস পেটে পড়েছিল, সেগুলোই যেন আর্তস্বরে ভ্যা ভ্যা করতে করতে কণ্ঠস্বরে এসে জমাট বেঁধে আছে।

লবণহ্রদের গাজনমেলা এখন আর কেউ কল্পনাও করতে পারে না, তবে হয়তো কান পেতে শুনলো ফ্যালারামের আর্তস্বর আর তার আদুরে পাঁঠাটির ভ্যা ভ্যা শব্দ শোনা যেতে পারে।

পঞ্চম অধ্যায়

নিরাশ্রয়ের আশ্রয় লবণহ্রদ

সুন্দরবনের ডাকাত রাজা ছিল কাদের ঢালি—তার পাকা বাড়ী ছিল বারাসতে। ওদিকে কলকাতায় বনেদী ডাকাত ছিল বিশু ডাকাত—বিশ্বনাথবাবু বলে পরিচিত ছিল, পাল্কীতে করে ডাকাতি করতে যেতো। আগেই চিঠি দিয়ে আসতো যাতে রাতের অভ্যর্থনায় কোন ত্রুটি না হয়। নিজে পাল্কীতে করে যেতো—সঙ্গে যেতো লেঠেল বরকন্দাজ হাতে লাঠি, মাথায় ঝাকড়া চুল, মাথায় তাদের গোঁজা জবা-ফুল। ডাকাতের দল মশালের আলোতে রাস্তা করে নিয়ে ডাকাতি কবতে আসতো। আসবার পথে তারা কালী পূজ করতো। অধিকাংশ সময় পূজোতে নরবলি দেওয়া হত। মায়ের চরণে প্রদত্ত বিল্বপত্র মাথায় গুঁজে, মায়ের কাবণবারি আস্বাদন করে চলতেন বিশ্বনাথবাবু ডাকাতি করতে। দমদমে যেতে হলে তাকে লবণহ্রদের পথ ধরে যেতে হতো। মাকালীর চরণে ঐকান্তিক প্রার্থনা ছিল যেন সে রাত্রে নরহত্যার মধ্য দিয়ে ডাকাতি সার্থক হয়ে ওঠে। গৃহস্থও মা কালীর সামনে প্রার্থনা জানাচ্ছে যে সে যেন ডাকাতের হাত থেকে নিস্তার পায়। দেবীর কি বিড়ম্বনা। গৃহস্থকে বাঁচালে ডাকাতের পূজা পাওয়া যায় না—আর ডাকাতের প্রার্থনা শুনলে গৃহস্থের নিকট মান থাকেনা। সাপের কথা শুনলে ব্যাঙের প্রাণ যায়, আর ব্যাঙের কথা শুনলে সাপ ক্ষুধার্ত থেকে যায়।

লবণহ্রদের সঙ্গে কলকাতার যোগাযোগ নদীপথেও ছিল।

"কলকাতার উত্তর দিকে ছিল একটি ছোট্ট নদী বা Creek। নদীটি লবণহ্রদ থেকে উঠে, যেখান দিয়ে বর্তমানের বেলেঘাটা রোড, ক্রীক রো (Creek থেকেই এই নামের উৎপত্তি), ওয়েলিংটন স্কোয়ার, হেষ্টিংস স্ট্রিট প্রভৃতি রাস্তা নির্মিত হয়েছে তার ওপর দিয়ে প্রবাহিত

হয়ে হুগলী নদীতে পড়তো। কালীঘাট থেকে চাঁদপাল ঘাট পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এর মোহনা। মালবাহী বড় বড় নৌকা এই নদীতে চলাচল করতো"।—(কলকাতা সমাচার,—প্রণব কুমার ঘোষ)

কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম বর্ণিত শ্রীমন্ত সদাগরের বাণিজ্য-যাত্রায় যে নদীপথের কথা বলা হয়েছে, তারও হয়তো লবণহ্রদেই উৎপত্তি, এই নদীটিই প্রবাহিত হয়েছিল বেলেঘাটার মধ্য দিয়ে। এই নদীপথেই হয়তো যাত্রা করেছিল শ্রীমন্ত সদাগর—

বালিঘাটা এড়াইল বেনিয়ার বালা
কালীঘাটে গেল ডিঙা
অবসান বেলা॥
মহাকালীর চরণ পূজেন সদাগর,
তাহার মেলান বেয়ে
যায় মাইনসর॥

এখানকার কালীঘাটই হলো বেলেঘাটা। কল্পনা করা যেতে পারে যে লবণহ্রদে জন্ম যে নদীর, তার সঙ্গে নিশ্চয় যোগসূত্র ছিল সুন্দরবনের, এবং যে নৃত্যপরা বিদ্যেধরী লবণহ্রদের বুক চিরে ক্ষিপ্রবেগে ছুটে চলেছে—লবণহ্রদের এই নদীটি নিশ্চয় বিদ্যাধরীর সহোদরা। নদীর দুই তীর ছিল ঘন জঙ্গলে ভরা—একদিকে ছিল হিংস্র শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যানী আর অন্য দিকে হিংস্রতর দস্যু-ডাকাত। নদীপথে অথবা হাঁটাপথে দলে দলে যাত্রীরা যেতো কালীঘাটের মন্দিরের উদ্দেশ্যে—তারাই ছিল সহজ শিকার—নিশাকালে হিংস্র পশুর মুখে আর দিবাকালে হিংস্রতর চোর ডাকাতের হাতে। লবণহ্রদের নদীটি ছিল প্রথমে শীর্ণকায়, পরে এটি বিশাল হতে বিশালতর হয়ে যেখানে হুগলী নদীতে পড়েছে সেখানে মোহনা—কালীঘাট থেকে চাঁদপাল ঘাট পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগেই কালীঘাটের মন্দিরকে কেন্দ্র করে এক জমজমাট পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে! বহু দূরদূরান্ত থেকে ধনীদরিদ্র সবাই হাজির হতো মন্দিরে পূজা দিতে। মহারাজ নবকৃষ্ণ এখানে

পূজো দিয়েছিলেন প্রায় এক লক্ষ টাকা খরচ করে। তখনকার দিনে অনেক ইংরেজও আসতেন মন্দিরে পূজা দিতে—এমন ইংরেজও ছিলেন যিনি দশগাজার টাকা খরচ করে ধূমধামের সঙ্গে মন্দিরে পূজা দিতেন। দেশীয়দের সংস্পর্শে এসে ইংরেজরাও শিখে নিয়েছিল গডকে বাগে আনতে হলে কিছু ভেট দেওয়া দরকার। ভেটের মহিমা সর্বত্র—জমিদার বাড়ীর দেউড়ি পার হতে হলে চাই ভেট, চাকরী বাগাতে হলে দিতে হবে ভেট, ইংরেজ শাসকের খেতাব পেতে হলে ভেট পাঠাতে হবে, মেয়ের শাশুড়ীকে হাতে রাখতে হলে পাঠাতে হবে নিয়মিত ভেট—বৈতরণী পাব হতেও চাই ভেট, মামলা জিততে মন্দিরের দোরগড়ায় মানত করতে হয় ভেটের। ভেটের আবার বৈচিত্র্য কত! কোন জায়গায় নোট, কোন জায়গায় নটী, কোন জায়গায় শিক্কাটাকা, আবার কোন জায়গায় জমিজমা—কোন দেবী তুষ্ট হন ছাগশিশুতে, কোন দেবীর দাবী নরমুণ্ড।

কালীঘাটে ইংরেজরা মামলা জিতে, চাপরাশীর স্কন্ধে ছাগশিশু চাপিয়ে মন্দিরে উপস্থিত হতেন—এবং হাজার হাজার টাকা খরচ করে ধূমধামের সঙ্গে পূজো দিতেন। এখানে পূজা দিতে আসতেন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, মহারাজ গোপীমোহন দেব। এঁরা যখন পূজা দিতে আসেন তখন তো পুলিশ মোতায়েন করতে হতো ভীড় ঠেকাবার জন্যে।

কালীঘাটে মানত শুধু পূজোই ছিল না। মানতের জন্যে আসতো জিহ্বাবলি, আসতো অঙ্গুলি বলে।

১৮৬৬ এর পূর্বে লবণ হ্রদের রাজস্ব আদায়ের কোন ব্যবস্থা ছিল না। জমিদারেরা খেয়ালখুশীমতো ভোগদখল করতো। সুন্দরবন সর্বপ্রথম পোর্ট ক্যানিং কোম্পানীকে বাৎসরিক আট হাজার টাকায় বন্দোবস্ত দেওয়া হয়। ১৮৬৯এ গভর্ণমেণ্ট সুন্দরবনের ব্যবস্থা স্বহস্তে গ্রহণ করলো। ১৮৭২এ ডেপুটি কমিশনার অফ ফরেস্টস্ মিঃ শ্লিন বনবিভাগের আর্থিক গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। লবণ হ্রদও প্রথম ইজারা দেওয়া হয় ভবনাথ সেনকে ১৮৬৯এ। লবণ হ্রদে লবণ প্রস্তুতের

ইতিহাস বিশেষ জানা যায় না। গান্ধীজীর বিশ্বস্ত ভক্ত এবং সতীশ দাশগুপ্তের সহকর্মী লক্ষ্মীকান্ত প্রামাণিক লবণ আইন ভঙ্গের আন্দোলনের সময় লবণ তৈরী করে কারাবরণ করেছিলেন এই লবণ হ্রদের মাটিতেই। তবে সুন্দরবনের বহু স্থানেই নেমকখানাড়ী অর্থাৎ লবণ প্রস্তুতের কারখানা ছিল। বৃটিশের দমননীতির ফলে এগুলো সব বিনষ্ট হয়ে যায়।

যেহেতু লবণহ্রদ বারমাসই জলের তলে বিরাজ করতো সেইজন্য লবণহ্রদে অতীতে কোনও বাসস্থান ছিল কিনা হলফ্ করে বলা যায় না। তবে সুন্দরবন এলাকায় একটু ঘোরাঘুরি করলে দেখা যায় সেখানে একসময় অনেক জমিদার এবং বর্দ্ধিষ্ণু লোকের বসতি ছিল। সুন্দরবনের মধ্যে ছড়ানো রয়েছে বৌদ্ধস্তূপ আর হিন্দুমন্দির— দু এক-জায়গায় মস্‌জিদ্‌ও দেখা যায়। তাছাড়া এখানে পাওয়া গেছে লোহার সিন্দুক—কামার বাড়ীর চিহ্ন ইত্যাদি।

বিধান রায়ের আশীর্বাদধন্য, গঙ্গোদক ও গঙ্গামাটিকে অভিষিক্ত লবণহ্রদ জন্ম নিল ১৯৬২ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী—নবজাত শিশুটি সদ্য ভূমিষ্ঠ। মাত্র দশ মাস বয়স—সবেমাত্র হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে চলেছে একটু একটু করে উত্তর থেকে দক্ষিণের দিকে, পশ্চিম হতে পূর্ব দিগন্তে—হামাগুড়ির পর্ব শেষ হতে না হতেই ভারতের পূর্বাঞ্চলে ভারত-চীন সীমানায় রণদামামা বেজে উঠলো—লবণহ্রদের পরিকল্পনায় এক বিরাট ধাক্কা লাগলো—শিশুটি ভীত সন্ত্রস্ত—চলার গতি রুদ্ধ হলো।

* * *

ভারত-চীন যুদ্ধ এসেছিল ভারতের বুকে এক বিরাট উল্কার মতো—ভারতের সামরিক ইতিহাসে এক কলঙ্কের অধ্যায় রচনা করে। উত্তরপূর্ব সীমান্তে যুদ্ধের ঘূর্ণিবায়ুর ঝড় প্রায় চার হাজার অসহায় ভারতীয় সৈন্যকে কৃষ্ণমেননের দুর্বল সামরিক নীতির যুপকাষ্ঠে বলি দিয়ে হঠাৎ শেষ হয়ে গেলো। কিন্তু যুদ্ধের আতঙ্কের ছায়া ছড়িয়ে পড়েছিল লবণ-

হ্রদের পরিকল্পনার ওপর—পরিকল্পনার রূপায়ণে আচমকা ধাক্কা লাগলো—অবশ্য সেটা বেখাপাত করতে পারেনি বেশী—কাজ এগিয়ে চলল ক্ষণিকের ধাক্কা আচমকা কেটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে।

কয়েক বছরের ব্যবধান—আবার ১৯৭১ সালে লবণহ্রদের ভাগ্যাকাশে দেখা দিল একখণ্ড কালো মেঘের ছায়া—পাকিস্তানের জঙ্গী শাসকের সর্বাধিনায়ক ইয়াহিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করলো ভারতের বিরুদ্ধে।

আলোচনার নামে পশ্চিমী অধিনায়কেরা ঢাকায় এসে হাজির হল। মুখে শান্তির বাণী—পিছনে শাণিত ছুরিকা। ইয়াহিয়া ভেবেছিল যে আয়ুব খাঁর ভাষায় 'পিটিয়েই শায়েস্তা করা যাবে'—কিন্তু সে ভুল যখন ভাঙলো, তখন ইয়াহিয়া গদীচ্যুত—মুজিব উদিত বাংলার আকাশে।

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ ইয়াহিয়া ঢাকা থেকে আলোচনা ব্যর্থ করে চম্পট দিলেন ঢাকার উপর সর্বপ্রকার অত্যাচারের নিখুঁত ব্যবস্থা করে। মধ্যরাতে দেখা গেল বৈশ্বানরের তাণ্ডব লীলা—আগুন জ্বলে উঠলো।

সোনার বাংলা হলো ছারখার। ঢাকা এক মহাশ্মশানে পরিণত হলো। সেই ঘৃণিত নরকযন্ত্রণা থেকে ত্রাণ পাবার আশায় শহর গ্রাম শূন্য করে, পিতৃপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে হাঁটা পথে, নৌকায়, খালবিল পেরিয়ে নদীনালা ডিঙ্গিয়ে জলস্রোত চললো পশ্চিমবাংলার দিকে—ছিটিয়ে পড়লো আসামের জঙ্গলে, মেঘালয়ের পাথুরে রাস্তায়—অন্ধকার থেকে আলোর সন্ধানে। পথের কোলেই ঢলে পড়লো কত অসহায় নরনারী—অশক্ত বৃদ্ধা ও রুগ্ন শিশু। শরণার্থীর দল চলেছে কাতারে কাতারে—সঙ্গী হলো মহামারী আর কলেরা, মৃত্যুর মর্মান্তিক হাহাকার। একমাত্র শকুনি ও কুকুরের আনন্দ কোলাহল—অগনিত মৃতদেহ ছড়িয়ে পথের প্রান্তে আনাচে কানাচে—চলেছে কুকুর আর শকুনির নিরন্তর লড়াই।

সীমাহীন এই জনস্রোত—খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হোঁচট খেয়ে, লাঠিতে ভর দিয়ে চলেছে অশীতিপর বৃদ্ধ, আবরু-পর্দার আড়াল থেকে হঠাৎ

বেরিয়ে আসার আচমকা নিয়ে অসহায়, হতবাক বিস্ময়াবিষ্ট তরুণীর দল, মাতৃহারা শিশু, স্বামীহারা স্ত্রী, পুত্রহারা মাতা—সকলেই চলেছে আলোকের সন্ধানে, আশ্রয়ের আশায়। আশ্রয় পেলো তারা পশ্চিমবঙ্গের শ্যামলিমায়, আসামের উর্বরতায়, মেঘালয়ের বন্ধুর উপত্যকায়—আর পেলো লবণহ্রদের বালুর মাঠে।

লবণহ্রদের বাহাত্তর ইঞ্চি পাইপ আশ্রয় দিল নিরাশ্রয় অগণিত গৃহহারা শরণার্থীদের। শহর লবণহ্রদ যে পাপ করেছিল আলাজনদের উৎখাত করে, জেলেজনদের জীবিকা উপার্জনের পথ বন্ধ করে, মেয়েজনের কর্মক্ষেত্র, লীলাক্ষেত্র ভেড়ি ভরাট করে, আবার প্রায় ১০ বছর পরে সেই উঠতি শহরের পাপস্খালন হলো দুর্গতি, ব্যথিত, অত্যাচারিত ধর্ষিত, শরনার্থীর বিশাল জনস্রোতকে আশ্রয় দিয়ে।

লবণহ্রদ ভরে উঠলো, হাজার হাজার তাঁবুতে—রচিত হলো শরণার্থী শিবির। কিছুদিন আগেও যেখানে ভেড়িতে হাজার হাজাব মাছ জলের তলে খেলা করে বেড়াত, সকালের মিষ্টি রোদে, পুচ্ছতাড়নায় জলের বুকে তরঙ্গ রচনা করতো—ঠিক সেই জায়গায় দেখা দিল হাজাব শিশুর মেলা—দুঃস্বপ্নের রাত পেরিয়ে পৌঁছে গেছে আনন্দঘন প্রভাতী পরিবেশে। শেষ হলো তাদের আতঙ্কিত পথ চলা, শেষ হলো সীমাহীন দুঃখ-ক্লেশ। আশ্রয় পেলো ভারতের মাটিতে, পশ্চিমবাংলার কান্তাবে প্রান্তরে—লবণহ্রদের বাহাত্তর ইঞ্চি পাইপের অভ্যন্তরে। ৭ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল লবণহ্রদে পাইপের জন্যে। আশ্রয় দিল প্রায় ৭ লক্ষ নিরাশ্রয় শরণার্থীর—বিংশ শতাব্দীর মানুষ আবার পিছু হটে চলে গেলো গুহার যুগে, সৃষ্টি হলো নলমানবের। ছেলেরা কয়লার অথবা লোগার টুকরায় কতই না আঁকিজুকি কেটে দিল খেলার ছলে—হাজার বছর পরে কোন প্রত্নতাত্ত্বিকের হাতে যদি পড়ে তবে তারা কি এই উদ্বাস্তু শিশুদের অঙ্কনধারা বিশ্লেষণ করে বলতে পারবে কত দুঃখে, কত ব্যথায়, কত ত্রাসে, কত শঙ্কায় এরা কাটিয়েছে দুঃস্বপ্নের এই দিনগুলি।

লবণহ্রদের তাঁবুর শহরে গড়ে উঠলো এক নতুন জীবন। কৃষ্ণপুরের

খালের পারে গজিয়ে উঠলো ব্যাঙের ছাতার মতো উদ্বাস্তুদের কলোনী —শিশুদের মুখে আবার ফুটে উঠলো হাসির রেখা। যৌবনের চোখে জেগে উঠলো অনাগত ভবিষ্যতের রঙিন ছবি, তরুণীরা পেলো আবার তাদের লজ্জার আবরণ, স্বপ্ন রচনার খোরাক, প্রৌঢ়রা পেল অনাবিল আনন্দের সঙ্গী, অবসর বিনোদনের উৎস বৃদ্ধেরা পেলো অফুরন্ত অবসর —অতীতের ফেলে আসা দিনগুলির টুকরো টুকরো কাহিনী নিয়ে জাল-বোনা আর তুলনামূলক বিশ্লেষণ করার সীমাহীন সময়। শুনেছে তারা ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের দুঃখভরা কাহিনী, দেখেছে তারা বিয়াল্লিশের মানুষে গড়া দুর্ভিক্ষের মর্মন্তুদ দৃশ্য, কাটিয়েছে তারা নিদ্রাহীন রজনী চুয়াল্লিশ সালের বোমারু বিমান ভরা আকাশের তলে, স্বচক্ষে দেখেছে তারা সাতচল্লিশের বীভৎস সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা—তারপরে এই একাত্তরের নারকীয় ঘটনা—শান্তির শয্যা থেকে দম্পতীকে টেনে হিচ্‌ড়ে গুলি করে মার', কোলের শিশুকে ছিনিয়ে নিয়ে আগুনে ছুঁড়ে ফেলা, ছাত্রীদের হোটেলে ঢুকে তরুণীদের যৌবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা, তারপরে মৃত্যুর হাত থেকে ছিট্‌কে এসে অনাহারে।

লবণহ্রদের শরণার্থীতে ভরা তাঁবু শহর দেখতে এলেন টেড কেনেডি আমেরিকা থেকে, জেনিভা থেকে এলেন রাষ্ট্রপুঞ্জের উদ্বাস্তু সংক্রান্ত হাইকমিশনার প্রিন্স সদরুদ্দিন আগা খাঁ, এসেছেন বৃটিশ এম পি আর্থার বটমলি।

কেনেডি বংশের একমাত্র কুলপ্রদীপ টেড কেনেডি লবণহ্রদের শিবির পরিদর্শন করে মুগ্ধ হলেন শিবির পরিচালনার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায়, বিচলিত হলেন উদ্বাস্তুদের মুখে পাক্ বাহিনীর বর্বরতার বৃত্তান্ত শুনে। লবণহ্রদের বাহাত্তর ইঞ্চি পাইপের মধ্যে মাথা নীচু করে ঢুকে, দুঃখে ভরা, বিষাদে নুইয়ে পড়া লোকগুলির পাশে বসে দুটো সান্ত্বনার কথা বলে তাদের মুখে হাসি ফোটাতে চেষ্টা করলেন। সেদিনটা ছিল বর্ষার মেঘে ভরা আকাশ, অঝোর ঝরে বৃষ্টি পড়ছিল, সেই বৃষ্টির মধ্যেই ভিজতে ভিজতে টেড কেনেডি এক পাইপ ছেড়ে আর এক পাইপে

চলেছেন নল মানবের দৈনন্দিন জীবনগুলির সঙ্গে পরিচিত হতে। টেড কেনেডি আর শরণার্থী আরফান মিঞা দুজনে যখন পাশাপাশি বসে কথা বলছিলো, তখন তাজ্জব হতে হয় ভেবে যে পৃথিবীর পরিধি কতটুকু —দুজনের মধ্যে পার্থক্য কতটুকু—একজন এসেছে আমেরিকার সল্টলেক সিটির কাছাকাছি এক শহর থেকে আর একজন উদ্বাস্তু হয়ে এসেছে ভারতে তথা কলকাতার সল্টলেক সিটিতে। সত্যই পাতাল রেল—যদি পাতাল ফুঁড়ে চলতে আরম্ভ করে তবে ঘণ্টায় ১০০ মাইল বেগে চললে মাত্র ৮০ ঘণ্টায় পৌঁছে যাওয়া যায় কলকাতার সল্টলেক সিটি থেকে আমেরিকার সল্টলেক সিটিতে।

টেড কেনেডি ফিরে গেলেন আমেরিকায়—সেখানে নিক্সনের প্রশাসনের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন চালালেন, ভারতের নীতির সমর্থন করলেন—আমেরিকার জনগণের মধ্যে এক বিরাট জাগরণ আনলেন সর্বহারা উদ্বাস্তুদের প্রতি সহানুভূতির, খণ্ডন করলেন ইয়াহিয়ার ভারতের বিরুদ্ধে অপপ্রচার।

রাষ্ট্রপুঞ্জের হাই কমিশনার প্রিন্স সদরুদ্দিন আগা খাঁ লণ্ডনে ফিরে গিয়ে বলেন যে লবণহ্রদের উদ্বাস্তু শিবির কাঁটা তার দিয়ে ঘেরা, সেটা নিঃসন্দেহ, কিন্তু সেই কাঁটাতারে ঘেরা শিবিরে শিবিরে যে আনন্দোচ্ছল জীবন প্রবাহ দেখেছেন, হাজার হাজার মানুষের সুশৃঙ্খল সহাস্য সমাবেশ এক অভাবনীয় ব্যাপার তিনি তাঁর হার্দিক অভিনন্দন জানালেন ভারতীয় প্রশাসনকে এই বিশাল আতিথেয়তার জন্য।

সমস্যা যে কত বিরাট, কত বিপুল, তা প্রত্যক্ষদর্শীদের পক্ষেও বিবরণ দেওয়া কষ্টসাধ্য—দুর্গত উদ্বাস্তু জনস্রোতের বিরাট ঢেউ প্রতিদিন আছড়ে পড়তে লাগলো ভারতের মাটিতে, পশ্চিম বাংলার বুকে লবণহ্রদের শুকনো বালুর মাঠে। দেশবিদেশের বহু প্রতিনিধি এলো সাহায্যের প্রতিশ্রুতি নিয়ে, কিন্তু যা এসে পৌঁছাতে লাগলো তা প্রয়োজনের তুলনায় গোস্পদ। লবণহ্রদে তখন দু-এক খানা বাড়ী মাথা তুলে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে—উদ্বাস্তুদের মধ্যে দু একটি পরিবার

এসে দখল করেও বসেছিলেন। মালিকদের কোনও বেগ পেতে হয়নি।

লবণহ্রদের উদ্বাস্তু শিবিরের পরিচালনার ভার ছিল বিশ্ববিখ্যাত সাঁতারু মিহির সেনের ওপর। তাঁর সুব্যবস্থায় এবং সুপরিকল্পনায় লবণহ্রদের শিবিরে এক সুশৃঙ্খল জীবনযাত্রার প্রবাহ দেখা গেলো।

উদ্বাস্তুদের সাহায্যে যেমন এগিয়ে এসেছিল সরকারী প্রতিনিধিদল, তেমনি এগিয়ে এলো বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি—বিদেশ থেকে এলো 'কাসা', অকস্‌ফাম—দেশের প্রায় সব প্রতিষ্ঠানের সাড়া পাওয়া গিয়েছিলো। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো 'রামকৃষ্ণ মিশন' এবং 'ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ'। শরণার্থীদের জীবনধারণের দৈনিক খরচ প্রায় ১ কোটি টাকা। একাত্তরের এপ্রিলে আশ্রয় সন্ধানীদের আসা শুরু হলো ভারতের মাটিতে—এদের দেশে ফিরিয়ে দেবার পরিকল্পনা হলো বাহাত্তরের মার্চের মধ্যে—এই এক বছরের ভারত সরকারের খরচ ৩৭২ কোটি টাকা, তার মধ্যে বিদেশ থেকে এসে পৌঁছালো মাত্র ২৬ কোটি টাকা—যদিও প্রতিশ্রুতি ছিল ৭২ কোটি টাকার উপর।

শরণার্থীদের সংখ্যা হলো প্রায় এক কোটি। সংগ্রহ করা হলো দেশ বিদেশ থেকে ৮২ হাজার তাঁবু আর ২৪ হাজার ত্রিপল—গড়ে তোলা হলো শিবির শহর লবণহ্রদে, আসামে, মেঘালয়ে—অস্থায়ী আশ্রয় পেলো নিরাশ্রয় ভাগ্য বিড়ম্বিত জনসমষ্টি, ক্ষুধার অন্ন পেলো ক্ষুধিত মানুষ, পীড়িত সান্ত্বনা লাভ করলো ওষুধে, সেবা হস্তে সুচিকিৎসায়।

আবার যাত্রা শুরু হলো—পিছনে ফেলে এলো তাঁবুর ঘর আর লবণহ্রদের বাহাত্তর ইঞ্চি পাইপের সারি—সঙ্গে নিল ভারত সরকারের দেওয়া শীতবস্ত্র, পরিধেয় জামাকাপড় আর অফুরন্ত স্নেহ ভালবাসার স্মৃতি। বাঙাল চলেছে ঘরমুখো—শহরে পৌঁছে, গ্রামে গঞ্জে পৌঁছে কি দেখবে, সেই অজানা আশঙ্কায় বুক দুরুদুরু—আছে কি অক্ষত, ফেলে আসা ঘরবাড়ী—স্বজন পরিজন—কত প্রশ্নই না উঁকিঝুঁকি মারে মনের গহনে—অন্তরের মাঝে। ভাঁটার স্রোতে যেমন ভেসে এসেছিল হাজারে হাজারে ভাগ্য বিড়ম্বিত, হতাশায় ভরা, বিষাদক্লিষ্ট, মৃত্যুভয়ে

জড়িত—২৯২ দিন পরে আজ আবার চলেছে জনস্রোত জোয়ারের বেগে—স্বাধীন সোনার বাংলা দেশে।

স্মৃতির জালে জড়ানো ছিল কত বিদেশীদের আশ্বাস বাণী—প্রিন্স সদরুদ্দিন আগা খাঁ, আর্থার বটমলি, টেড কেনেডি—আরো কত হোমরা চোমরা উঁচুদরের লোক এসেছিল সহানুভূতি জানাতে, সমবেদনা দেখাতে—পাইপের মধ্যে গৃহহারা এই উদ্বাস্তুদের পাশে বসে, তাঁবুর ভেতরে ও বাইরে এদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কত কথাই না গেল—ভাষার প্রভেদ, রক্তের পার্থক্য, রঙের ভিন্নতা, কোনটাই বাধা মানলো না।

এবারের চলার রূপ অবশ্য একেবারেই ভিন্ন রকমের—নেই মৃত্যুর বিভীষিকা, নেই শকুনির বিকট বুক কাঁপানো স্বর, নেই হিংস্র জানোয়ারের দাপাদাপি. নেই পিছনে জানোয়ারের চেয়েও হিংস্র ইয়াহিয়ার এন্তার গুলির আওয়াজ।

এবারে চলেছে ট্রাকে করে, প্লেনে করে, নৌকায়—সঙ্গে রয়েছে খাবার, রয়েছে মিত্রবাহিনীর সান্ত্রী আর রয়েছে ফেলে আসা সম্পদ ফিরে পাবার মনোবল।

শহরে গঞ্জে, গ্রামে আবার জন কোলাহল—খুশির উল্লাস—আনন্দের উচ্ছ্বাস।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিধান রায়ের আশীষধন্য লবণহ্রদ

১৯৭১ সাল, ১৬ই ডিসেম্বর, অপরাহ্ন ৪-২১ মিনিট—ঢাকার রেসকোর্সে 'জয় বাংলা' ধ্বনির মধ্যে পাক বাহিনীর বাংলা দেশ অভিযানের সর্বাধিনায়ক আমীর আবদুল্লা খান নিয়াজি আনুষ্ঠানিক ভাবে আত্মসমর্পন করলো ভারতীয় সেনাবাহিনীর অধিনায়ক জগজিৎ সিং অরোরার হাতে।

নিয়াজি পরে স্বীকার করেছিল যে তার সব আশা চূর্ণ হয়ে গেল যখন শেষ পর্যন্ত কোন বিমানবাহিনী পাঠাতে ইয়াহিয়া তার অক্ষমতা জানালো—যখন সমস্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে সপ্তমবহর নিয়ে বঙ্গোপসাগরে জাঁকজমক করে বসে শুধু নিষ্ফল হুমকি দিয়েই ক্ষান্ত থাকলো।

১৬ই ডিসেম্বর সব কিছু পাল্টে গেলো—আগে ঢাকায় পাকিস্তানীরা ছিলো প্রভু আর বাঙালীরা ছিল দাস - এখন হলো বাঙালীরা স্বাধীন মুক্ত আর পাকিস্তানীরা বন্দী পরাধীন।

ঢাকার পথে পথে শ্লোগান উঠলো—

"স্বাধীন বাংলা জিন্দাবাদ
শেখ্ মুজিব জিন্দাবাদ
ইন্দিরা গান্ধী জিন্দাবাদ"

রাজপথের দেওয়াল নতুন পোষ্টারে ভরে গেল—

"বাঙলার হিন্দু, বাঙলার খ্রীষ্টান, বাংলার বৌদ্ধ, বাংলার মুসলমান, আমরা সবাই বাঙালী"।

তখন সেই নিবিড় লোকসমাগমের মধ্যে দাঁড়িয়ে এরফান মিঞা, মহম্মদ ইসরাজ আর আসগর আলির দল হয়তো ভাবছিল এপার বাংলার লবণহ্রদের শিবিরে পাওয়া অফুরন্ত ভালবাসা আর অসীম স্নেহের কথা আর লবণহ্রদের বাহাত্তর ইঞ্চি পাইপের আশ্রয়ে নিশ্চিন্ত নিরাপদ দিনগুলির কথা।

বিধান রায়ের আশীষধন্য লবণহ্রদ

১৯৬৭ সাল, ২৭শে ডিসেম্বর, লবণহ্রদে অনুষ্ঠিত হলো অখিল-ভারত জাম্বুরির। গভর্ণর সাহেব অধিবেশনের প্রারম্ভে ঘোষণা করলেন, হাজার হাজার স্কাউট বিভিন্ন প্রদেশ থেকে এসে যোগদান করলো—সঙ্গে এলো কয়েক হাজার গার্লস গাইড। লবণহ্রদের বালুর মাঠে কয়েকশো তাঁবু ফেলা হলো সারিসারি, কুচকাওয়াজ চলতে লাগলো কয়েকদিন ধরে—সন্ধ্যায় শীতের পরিবেশে 'ক্যাম্প ফায়ার' আয়োজন হলো—সমস্ত লবণহ্রদ প্রাণবন্ত হয়ে উঠলো আনন্দোচ্ছল জীবনের স্পর্শে। ধন্য হলো বালুর মাঠ কচি প্রাণের ছোঁয়া লেগে—উঠতি যৌবনের সান্নিধ্যে।

১৯৭২ সাল, ২৫শে ডিসেম্বর - লবণহ্রদের বালির পাহাড় ফুঁড়ে মাথা তুললো এক নয়া নগরী—নাম তার বিধান নগর। কংগ্রেসের অধিবেশন শুরু হলো—শঙ্কর দয়াল শর্মার সভাপতিত্বে। সমস্ত কলকাতার জীবনে এক নতুন স্পন্দন। সবার মুখে এককথা 'চলো বিধান নগর'। সাঁওতালরা আসছে মাদল বাজিয়ে, শহরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে ছেলেরা আসছে কুচকাওয়াজ করতে করতে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে আসছে ছাত্র ছাত্রীরা নানা রঙের পোষাক পরিচ্ছদ পরে, মেয়েরা দলে দলে আসছে দেশ বন্দনার গান গাইতে গাইতে।

বিধান নগরে দেখা গেলো এক নব জাগরণ, লোকের সমাগমে—আলোকের চোখ ঝলসানো দীপ্তিতে।

১৯৭২ সালে কংগ্রেসের চুয়াত্তরতম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হলো লবণহ্রদে অর্থাৎ বিধান নগরে। এটা হলো কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের দশম অধিবেশন।

প্রায় ৪৫ বছর পরে কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন—২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৭২ সাল। লবণহ্রদের নতুন নাম বিধান নগর প্রাণ চঞ্চল জনসমুদ্র আনন্দোচ্ছ্বাসে উদ্বেল—জনতার স্রোত প্রতি মুহূর্তে আছড়ে পড়ছে লবণহ্রদের বুকে।

চারিদিকে শিবির স্থাপন করা হয়েছে, স্বেচ্ছাবাহিনী শিবির, অতিথি

ও নবাগতদের জন্য বাসস্থান, গণ্যমান্য প্রতিনিধিদের আবাস, পুলিশের ব্যারাক, দমকলের জন্য ছাউনি। পানীয় জলের ব্যবস্থা, সব কিছুরই ব্যবস্থা করা হয়েছে কংগ্রেস অধিবেশনের সর্বাঙ্গীন সফলতার দিকে লক্ষ্য রেখে। পুলিশ কমিশনার রঞ্জিৎ গুপ্তের অধিনায়কত্বে সাড়ে ছয় হাজার পুলিশ দিবারাত্রি কর্মব্যস্ত। ১৪টি প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র, ২০ শয্যাবিশিষ্ট একটি হাসপাতাল, একটি সচল হৃদপিণ্ড-চিকিৎসা কেন্দ্র, নয়টি দমকল ছাউনি সবই ২৪ ঘণ্টা সেবা দিতে প্রস্তুত।

১৩০ একর জমি নিয়ে কংগ্রেস অধিবেশনের গণ্ডী টানা হল। এক একর জমির ওপর অতিথিশালা তৈরী হলো—খড়ের ছাউনি, শান্তি নিকেতনের অনুকরণে এর কাঠামো। ২ খানা শয়ন ঘর, ২টি বিরাট হলঘব, চারিদিকে ঘোরানো প্রশস্ত বারান্দা—সব নিয়ে ৪ হাজার বর্গ ফুট এর আয়তন।

ফুলে ভরা, বাগানে ঘেরা, পল্লী পরিবেশে মোড়া এই সুন্দর ভবনটির নাম হলো 'ইন্দিরা ভবন'।

কংগ্রেস মণ্ডপে ৫০ হাজার লোকের বসবাসের ব্যবস্থা হলো। ১৫ হাজার প্রতিনিধি এলেন বিভিন্ন রাজ্য কংগ্রেস থেকে। মণ্ডপের বেদীতে ১০০ জনের বসার স্থান করা হলো।

রাজ্য প্রতিনিধিদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থার জন্যে ৮টি রন্ধনশালা, এর মধ্যে ২টি দক্ষিণ ভারতীয় কায়দায়, ৫টি উত্তব ভারতীয়দের জন্যে আর ১টি বাঙালীদের জন্যে। অর্থাৎ প্রথম দুটিতে সম্বর আর বড়া, ৫টিতে চাপাটি আর আলুমটর আব অবশিষ্টটিতে ডাল আর ভাত। মাছ ভাতের প্রস্তাব নাকচ করা হলো কারণ কংগ্রেস অধিবেশনের কোন রন্ধনশালায় আমিষ প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল।

প্রতিবারের আহারের জন্যে ধার্য্য হলো ১ টাকা আর প্রাতঃরাশের জন্যে ৫০ পয়সা।

বিধান নগরে দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ মশার হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্যে মশারী আনা হলো ২০০০ আর মশককুল ধ্বংস করার জন্য বেগন স্প্রে

আনা হলো ১০০০ লিটার।

সমস্ত অধিবেশনের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার এবং শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যে মোতায়েন ছিল ২০০০ স্বেচ্ছাসেবক ও সাড়ে ছয় হাজার পুলিশ।

এয়ার লাইন্স এর টিকিটঘর খোলা হলো—খোলা হলো ডাকঘর সঙ্গে তারঘর—ব্যবস্থা ছিল টেলেক্সের আর এস, টি, ডির। বসাতে হলো বিজলী ঘর বা অফিস।

৪০টি সুসজ্জিত মণ্ডপে ব্যবস্থা হলো প্রদর্শনীর—সবচেয়ে আকর্ষণীয় হলো প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দ্বারা পরিচালিতটির। এখানে দেখানো হলো পাকিস্তানের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া প্যাটন ট্যাঙ্ক। স্যাবার জেট, এ্যাক্ এ্যাক্ কামান, আরোও হাজার রকমের দেশে প্রস্তুত আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র।

প্রদর্শনীতে আর একটি বিশেষ আকর্ষণীয় মণ্ডপ ছিল কৃষ্ণনগর ও কুমারটুলির শিল্পীদের তৈরী মাটির মূর্ত্তি—কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি ও সর্বভারতীয় নেতাদের—সে এক অপূর্ব সমাবেশ। দ্বারদেশে দণ্ডায়মান স্বয়ং গান্ধিজী সত্য ও অহিংসার অতন্দ্র প্রহরী।

মণ্ডপের অভ্যন্তরে তীক্ষ্ণধী আইনজ্ঞ ব্যবহারজীবী ডব্লু, সি, ব্যানার্জীর ভাবগম্ভীর মূর্ত্তি, তেজস্বী বক্তা সুরেন ব্যানার্জী জ্বালাময়ী বক্তৃতার মাধ্যমে ঘোষণা করছেন, লর্ড কার্জনের ঘোষণার প্রত্যুত্তরে। লর্ড কার্জন বলেছিলেন 'Partition of Bengal is a settled fact', সুরেন ব্যানার্জী দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন "The settled fact shall be unsettled"। মূর্ত্তিটির দিকে তাকিয়ে থাকলে মনে হয় যেন তার সেই বাণী এখনও লবণহ্রদের মণ্ডপে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন বিদ্রোহী সুভাষ—দেশবাসীর নিকট কাতর আবেদন "আমায় রক্ত দাও, আমি তোমায় স্বাধীনতা দেব"। হয়তো পরিমিত রক্ত আমরা দিইনি, তাই পরিমিত স্বাধীনতাও আমরা পাইনি।

শহর লবণহ্রদ পত্তন করতে প্রথম বাঁধা দেখা দিল ভেড়ির মালিকদের কাছ থেকে। অনায়াস লব্ধ উপছে পড়া লভ্যাংশ হতে

বঞ্চিত হবার ভয়ে রুখে দাঁড়াল দল বেঁধে। জেলেজনরাও তাদের নেতাদের অধীনে সভায় জমায়েত হয়ে প্রতিবাদ জানালো তাদের বংশ পরম্পরা ধরে যে ব্যবসা করে আসছে, গায়ের রক্ত জল করে যে কাজের মাধ্যমে জীবিকা অর্জন করে তা থেকে তাদের উৎখাত করার এই প্রচেষ্টার, রাজনৈতিক দলেরও অভাব হলো না—তারাও ভিড়ে গেল এই সুযোগে জেলেজন, মেয়েজনের, আলাজনের পক্ষ নিয়ে। তাদের দরদ উথলে উঠলো, এমন সুবর্ণ সুযোগ ছাড়া যায় না, বিশেষ করে নির্বাচন যখন আসন্ন।

১৯শে মে, ১৯৫৬ সাল কলকাতা গেজেটে গভর্নর বাহাদুরের এক নোটিশ বের হলো :

"এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে যে জনসাধারণের মঙ্গলার্থে সাদার্ন সল্টলেকের মধ্যে ৮৭৬০·৫০-র যে সব ভেড়ি আছে তাহা ১৮৯৪ সালের অ্যাকট্ নং ১ সেক্সন ৪ নং আইনের অধিকারে নিম্নলিখিত এলাকা হইতে উপরে লিখিত পরিমিত স্থান দখল করতে মনস্থ করিয়াছেন। ২৪ পরগনার অন্তর্গত—হাদিয়া, বাঙ্গুর, চৌভাগা, নোনাডাঙ্গা, ধাপা, কালিকাপুর, সন্তোষপুর, নয়াবাদ, করিমপুর, জগতি-পোতা, মুকুন্দপুর, পরগাছিয়া, তেঁতুলবাড়ি, পাঁচপোতা ইত্যাদি।"

যে সব জমি সরকার দখল করিবার মনস্থ করিয়াছেন, তাহা দেখাইয়া একটি মানচিত্র আলিপুরের স্পেশাল ল্যাণ্ড অ্যাকুইজিসন অফিসে টাঙ্গাইয়া দেওয়া হইল।

যদি উক্ত জমির কোন মালিক কোন রূপ আপত্তি জানাইতে চান তবে ২৪ পরগনার কালেক্টরের অফিসে ৩০ দিনের মধ্যে লিখিতভাবে কারণ দেখাইয়া তার আপত্তি লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

১৯৫৬ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারীর কলিকাতা গেজেটে ধাপা, মনিপুর ও কৃষ্ণপুর অন্তর্গত ভেড়িগুলির ১৭৩·৭০ একর পরিমিত স্থান দখল করবার নোটিশ দেওয়া হলো নর্থ সল্টলেক এক্সটেনশন এর জন্যে।

পরে কালেক্টরের কাছে আবেদন করার ফলে অনেক ভেড়ির দখল

ছেড়ে দেওয়া হলো।

লবণহ্রদ ওরফে সল্টলেক ওরফে বিধান নগর সমৃদ্ধ হতে সমৃদ্ধতর হতে চলেছে। শহর গড়ে উঠেছে তরতরিয়ে, নিত্য নতুন মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে বালির শহর থেকে একেবারে আনকোরা স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন প্রতিটি নির্মাণের মধ্যে—গৃহপ্রবেশ এখানে দৈনন্দিন ব্যাপার, থরে থরে ফুলের স্তবকের মত শোভা—কলকাতার লোক হঠাৎ দেখে হকচকিয়ে যায়—বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় আবর্জনার শহর কলকাতার গা জড়িয়ে এলিয়ে আছে এত সুন্দর পরিবেশ।

১৯৬২ সালের গঙ্গাগর্ভ হতে কুড়িয়ে কুড়িয়ে নিয়ে আসা পলি মাটির মণ্ড আস্তে আস্তে জমাট বেঁধে সুস্থ সবল একটি নবজাত শিশুর মূর্তি নিয়ে দাঁড়াল—শৈশবে একে অনেক হোচট খেতে হয়। কাদামাটিতে গড়া কলকাতা, বালিতে তৈরী এই লবণহ্রদ শহরটিকে মনে প্রাণে গ্রহণ করতে নারাজ—অনেক বনেদী জমির মালিক এর অকাল মৃত্যু ঘোষণা করলো। লোক পাঠাতে হলো যুগোশ্লাভিয়ায় এরই সমগোত্রীয় আর একটি শহরের হালচাল দেখে আসার জন্যে—অনেক বাগবিতণ্ড, অনেক সমালোচনা একে মাথা পেতে নিতে হলো, বালির আস্তরণে গা ঢাকা দিয়ে উপেক্ষিত এই শিশুটি জনসাধারণের তুচ্ছতাচ্ছিল্য সহ্য করে পড়ে থাকলো অনেকদিন, বহুদিন, বহুমাস, বহুবছর, তারপরে ১৯৭০ সালে প্রথম শুরু হলো এর চলা—হাঁটি হাঁটি, পায়ে পায়ে এগিয়ে চল্লো ভবিষ্যতের ডাকে—একটি একটি করে শহরের এলিয়ে পড়া শাখায় ফুটে উঠতে লাগলো নিত্য নতুন রঙের ফুল—রাঙিয়ে তুলল শহরটিকে।

সপ্তম অধ্যায়

সত্তরের দশকে লবণহ্রদ

সত্তরের লবণহ্রদের সঙ্গে আশীর লবণহ্রদের তুলনাই হয় না—যেমন তুলনা করা যায় না অষ্টাদশ শতাব্দীর কলকাতার সঙ্গে বিংশ শতাব্দীর কলকাতার।

একখানা বাড়ী সি, ই ব্লকে আর একখানা বাড়ী এ, বি, ব্লকে। সি, ই ব্লকের শরবিন্দু বাবু কুকুরটিকে সঙ্গে করে হাজির হতেন এ, বি, ব্লকের জিতেন বাবুর বাড়ীতে, এরপর আস্তে আস্তে দু-একখানা বাড়ী দেখা দিল মরুভূমির বুকে। এই ব্লকে সন্তোষ মুখার্জী আর বি, রায়ের বাড়ী—এর বাড়ীর ছাদে ছিল মুরগীর খামার, নীচে এক্সরে ক্লিনিক, পাশে অটোমোবাইল মেরামতির ব্যবস্থা, পিছনে ফুলের বাগান আর সামনে ডিস্পেন্স্যারী।

সন্তোষ মুখার্জীর বাড়ীতেই বোধহয় লবণহ্রদের প্রথম আড্ডাখানা—সকালে বসতো কথার আড্ডা। বিকালে হতো তাসের আড্ডা—কর্ত্তা গিন্নীব দুজনেরই আছে পান দোষ—পানের ডিব্বা সবসময়েই ভরপুর থাকতো—চায়েব গতিবিধি ছিল অনবরত, লোকজনের আনাগোনা ছিল অবারিত।

ইতিমধ্যে এ, বি, ব্লকে এলেন কাঞ্জিলাল মশায়, বি, এ ব্লকে এলেন বঙ্কিমবাবু, এ, ডি তে শ্যামবাবু, দাঁতের চিকিৎসক আর, এন, চৌধুরী এবং সেনগুপ্ত এলেন এ, এ'তে—নীচের তলাটা ভাড়া দিলেন পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ককে—সেটা এখন পাঞ্জাব ব্যাঙ্ক নামে পরিচিত সকল বাস-যাত্রীর কাছে।

এমনি করে লবণহ্রদের সোনার ফোর্ট ভরে উঠতে লাগলো একে একে। লোক সমাবেশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সঙ্গলিপ্সা সৃষ্টি করলো সঙ্ঘের—সংঘটিত হলো সভা সমিতি।

লবণহ্রদের সঙ্ঘের পথিকৃত হলো এ, বি ব্লক—জিতেনবাবুর গৃহ প্রবেশের কিছুদিন বাদেই গৃহপ্রবেশ করলেন ধূমধামের সঙ্গে কালিদাস বোস এ, বি. ব্লকে। অনুভব করলেন একটি সমিতির অভাব। সংগঠিত হলো নাগরিক সমিতির—লবণহ্রদের প্রথম সমিতি কালিদাস বোসের বাড়ীতে তারই সভাপতিত্বে।

নাগরিক সমিতি ১৯৭৩ সালে সমস্ত লবণহ্রদের প্রতিনিধিত্ব করতো—তারাই প্রথম বারোয়ারী পূজোর প্রচলন করে। লবণহ্রদে সবেমাত্র বাড়ী হতে শুরু হয়েছে। বিস্তীর্ণ অঞ্চলের বাসিন্দাদের কাছ থেকে চাঁদা সংগ্রহ করে সার্বজনীন পূজা করা খুবই কষ্টসাধ্য ছিল—কালিদাস বাবুর নেতৃত্বে সেটা সম্ভব হয়েছিল। নাগরিক সমিতিই প্রথম সরকারের আরোপিত করের পরিমাণের বিরুদ্ধে জিগির তোলেন, সম্মিলিত দাবী পেশ করেন ধার্য কর হ্রাসের জন্যে। স্মারকলিপির মাধ্যমে সম্ভবত এইটাই হলো লবণহ্রদের জনসাধারণের পক্ষ থেকে সরকারের নিকট পেশ করা প্রথম স্মারকলিপি।

কালের স্রোত গড়িয়ে চলেছে। লবণহ্রদ ক্রমশই ধোপদুরস্ত হয়ে উঠছে। লোকসংখ্যা বাড়ছে। দ্বিতীয় সমিতির প্রয়োজন দেখা দিল—সংগঠিত হলো 'সল্ট লেক ওয়েল-ফেয়ার অ্যাসোশিয়েশন' বি, ডি, ব্লককে কেন্দ্র করে। নাগরিক সমিতির প্রথম সমিতি হলো প্রথম সেক্টারের পশ্চিমাঞ্চলে আর সল্টলেক ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের প্রভাব পরিধি বিস্তৃত হলো প্রথম সেক্টারের পূর্বাঞ্চলে, যদিও এর সভ্য আছে প্রায় সব ব্লক থেকেই।

১৯৭৪ সালে এই নবগঠিত সমিতির জন্ম—শ্রী বি, আর, চক্রবর্ত্তী এর সভাপতি—জন্ম থেকেই এর প্রভাব ছড়িয়ে পড়লো লবণহ্রদের প্রথম সেক্টারের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে। প্রথম সেক্টারের সীমাই এর সীমা। বি, আর, চক্রবর্ত্তী নিজে হলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী—প্রভাব এর সর্বত্র—তাঁরই অধিনায়কত্বে ওয়েল-ফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন ধাপে ধাপে উন্নতির পথে এগিয়ে চল্ল। ১৯৭৪

সাল—সমস্যাসঙ্কুল লবণহ্রদ। লবণাক্ত জল, অন্ধকারাচ্ছন্ন পথঘাট, অপর্যাপ্ত যানবাহন, অসমাপ্ত পার্ক বাজার, নেই দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দোকান, ছেলেমেয়েদের জন্য স্কুল নেই, খেলার মাঠ নেই, বলতে গেলে সাধারণ জীবনযাত্রার কিছুই নেই।

এদিকে কেতাদুরস্ত শহর লবণহ্রদের অগ্রগতির জন্য চাই সবকিছুই। ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন, শহর লবণহ্রদের সর্বাত্মক উন্নতির প্রচেষ্টায় ব্রতী। এদের ঐকান্তিক চেষ্টায় ক্রমশ লবণহ্রদের অনেক কিছুই উন্নতি সাধিত হলো, বাজার বসলো, দোকান চালু হলো, স্কুলের পত্তন হলো। রাস্তাঘাটে আলো জললো—পার্কে পার্কে ছেলেমেয়েদের খেলার সাজ-সরঞ্জাম দেখা দিল—যানবাহনের যাতায়াত বৃদ্ধি পেলো। সল্টলেক ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনে সবচেয়ে বড় কীর্তি হলো ট্যাক্সের ব্যাপার নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের মামলা পরিচালনা করা এবং সল্টলেকের বাসিন্দাদের জন্য একটা ন্যায়সঙ্গত কর স্থির করা। প্রায় দুবছর মামলা চালিয়ে নিম্নলিখিত হারে কর ধার্য হলো :—

(ক) যে সব ক্ষেত্রে বাড়ির মালিক নিজেই বসবাস করছেন, সে সব ক্ষেত্রে বাড়ি তৈয়ার করতে যা খরচ লেগেছে তার ভিত্তিতে কর ধার্য করা হবে।

(খ) যে ক্ষেত্রে বাড়ির আংশিক অথবা পুরোটা ভাড়া দেওয়া হয়েছে সেক্ষেত্রে ভাড়ার ভিত্তিতে অর্থাৎ ভাড়ার শতকরা বিশ ভাগ কর দিতে হবে সরকারের খাজাঞ্চিতে।

(গ) জলকর ধার্য হলো ট্যাপ প্রতি—যে কটি ট্যাপ থাকবে বাড়ীতে সে কটি ট্যাপ গুণে দিতে হবে, প্রতিমাসে অবশ্য যেখানে একটা ট্যাপ থেকে টেনে ৩।৪টি ট্যাপ নেওয়া হয়েছে, সেখানে কর ধার্য হবে একটা ট্যাপের ওপর—যেমন ব্যথরুম—অধিকাংশ বাথরুমে থাকে বেশ কয়েকটি ট্যাপ, বেসিন থাকে, ঝরণা থাকে। কমোডের পাশে একটা, ওপরে একটা, বালতি ভরার জন্যে একটা, কাপড় কাচবার বেসিনের ওপর একটা, মেয়েদের ব্যবহারের জন্যে বিশেষ বেসিনের ওপর একটা

—এছাড়া বাথটব থাকলে তার জন্য ধরে রাখুন ২টো—কিন্তু আপনাকে দিতে হবে মাত্র একটি ট্যাপের কর। মহানুভব সরকার।

বাড়ী তৈয়ারীর খরচ হিসাব করা হবে প্রথম তলার নির্মাণ খরচ প্রতি বর্গফুট ৪০৲ আর তার উপর তলাগুলির খরচ ধরা হবে প্রতি বর্গফুট ৩৫ টাকা হিসাবে।

আবর্জনা স্তূপ সরানোর জন্যে মাসে পড়বে প্রায় ১ টাকার মতো, এই হিসাবের মেয়াদ হবে তিন বছর তারপর আবার পুনর্বিবেচনা করা হবে—অর্থাৎ বর্তমান ধার্য কর আরও বৃদ্ধি পাবে।

(ঘ) বর্তমান ব্যবস্থা চালু থাকবে ১৯৭৭ থেকে ৫ বৎসর পর্যন্ত —তারপর কর্মকর্তারা পুনরায় সভায় বসবেন বিচার করতে আর কতটা বাড়ানো যায়।

(ঙ) বকেয়া কর আদায়ের ব্যবস্থা হলো অর্থাৎ ১৯৭৭ থেকে বর্তমান ১৯৮০ পর্যন্ত—চলতি এক কোয়ার্টারের সঙ্গে যোগ হবে বকেয়া এক কোয়াটার। এই হিসাবে ৩ কাঠা জমির ওপর ১ তলা একখানা বাড়ীর মালিককে দিতে হবে মাসে আনুমানিক ১০ টাকার মতো যদি মালিক নিজে বাস করে।

এই কাজের জন্যে ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন লবণহ্রদের অধিবাসীদের কাছে ধন্যবাদার্হ।

১৯৮০ সালের ডিসেম্বর মাসের এক সাধারণ সভায় ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন স্থির করলেন যে তারা স্থানীয় সমিতিটিকে কেন্দ্রীয় সমিতিতে রূপান্তরিত করবেন।

এদিকে এগিয়ে এলেন সল্টলেক হাউসিং এষ্টেট এবং ব্লক অ্যাসো-সিয়েশন কোঅর্ডিনেশন কমিটি ঐ একই প্রস্তাব নিয়ে—উদ্দেশ্য সমস্ত সল্ট লেকের ব্লক অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধি নিয়ে একটি কেন্দ্রীয় সমিতি গঠন করা।

এ ছাড়া সল্ট লেক অথরিটির নির্দেশনায় সরকারীভাবে একটি উপদেশক সমিতি গঠিত হয়—স্থানীয় এম, এল, এ, শ্রী সুভাষ চক্রবর্তী

এর সরকারী উপদেষ্টা এবং শ্রী হরেকৃষ্ণ ঘোষ এর সভ্য।

যে চলার শুরু হয়েছিল সত্তরে, পা টিপে টিপে সন্ধিগ্ধচিত্তে— বাহাত্তরে কংগ্রেসের অধিবেশনের পর এর গতি হলো দ্রুত, দ্রুততর। জনসাধারণের দৃষ্টি পড়লো বালুর মাঠের দিকে। ক্রমশ কেতাদুরস্ত হতে থাকলো। বালুর আস্তরণের ওপর দেখা দিল নবদুর্বাদল— শ্যামায়মান হয়ে উঠলো লবণহ্রদের পরিবেশ। শহর লবণহ্রদ ভরে উঠলো বাড়ীতে, গাড়িতে, রাস্তার দুপাশে দেবদারুর সারিতে।

সত্তরে শহর লবণহ্রদের দুই পথিকৃত একজন চক্রবর্ত্তী আর একজন চ্যাটার্জি—একজন বাড়ী করলেন পশ্চিম প্রান্তে সি, ই ব্লকে, অন্যজন করলেন পূর্বপ্রান্তে—এ, বি ব্লকে—দুটোই প্রথম সেক্টারে।

পূর্বপ্রান্তের বাসিন্দা এলেন পশ্চিমবাংলার বহরমপুর থেকে আর পশ্চিমপ্রান্তের বাসিন্দাটি এলেন পূর্ববঙ্গ থেকে।

জিতেন চক্রবর্ত্তী আদিবাড়ী পূর্ববঙ্গের খুলনা জেলার মুলঘর গ্রাম। তাই নাম দিলেন নবনির্মিত বাড়ীটির 'মুলঘর'। দ্ব্যর্থবোধক নামটি— শহর লবণহ্রদের মুলঘর—প্রথম বসতবাটি—আবার স্বগ্রামের স্মৃতি-রক্ষার্থে নাম হলো মুলঘর। কাজ করতেন পূর্ত্ত বিভাগে, শহর লবণ-হ্রদের সৃষ্টির গোড়া থেকে এর সঙ্গে জড়িত।

লবণহ্রদের রোটারীক্লাবের এক সভায় লবণহ্রদের প্রথম অধিবাসীদের সম্মান দেওয়া হলো, একটি ফুলের স্তবক, একটি মনোজ্ঞ ভাষণের মাধ্যমে। জিতেনবাবু তার স্বভাবসুলভ বিনয়ের সঙ্গে উল্লেখ করলেন শ্রী শরবিন্দু চ্যাটার্জির নাম—বল্লেন, যে সম্মান তাকে দেওয়া হচ্ছে চ্যাটার্জি তার যোগ্য অংশীদার কারণ দুজনে একই দিনে গৃহপ্রবেশ করেছিলেন। তারিখটি হলো ৯ই মার্চ, ১৯৭০ (২৫শে ফাল্গুন)।

শরদিন্দুবাবুর সঙ্গে আদি লবণহ্রদের গল্প শুনতে গেলাম তাঁর বাড়ীতে। কথাপ্রসঙ্গে বল্লেন যে আজকাল লবণহ্রদের বাসিন্দাদের কাছে শুনতে পাই লবণহ্রদে কি নিদারুণ মশা—কিন্তু আমরা যারা বাড়ী করি সেই সত্তরে, তখনকার মশার তুলনায়, এখন মশা নেই

বল্লেই চলে। বিকেল চারটে বাজতে না বাজতেই দরজা জানলা সব বন্ধ করে সকলে চলে যেতাম ছাদে। প্রায় আধ লিটার বেগন স্প্রে ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে অন্ধকার হতে না হতেই আবার ছাদ ছেড়ে পালিয়ে আসতে হতো মশককুলের হাতে রাজ্যটি সমর্পণ করে। ঘরে ঢুকেই প্রথম কাজ সম্মার্জনী হাতে শতসহস্র মশকের মৃতদেহগুলির সদ্গতি করা—এদিক ওদিক তাকিয়ে একটি ঝুড়ি দেখিয়ে বল্লেন যে এরকম একটি ঝুড়ি করে মৃত এবং মৃতপ্রায় মশকদের ঘর থেকে বের করে তবে শয়নের প্রস্তুতি করতে হতো।

জিজ্ঞাসা করলাম, আপনাদের সময়ে সাপের উপদ্রব কিরকম ছিল ?

উত্তর দিলেন, সাপের কোন চিহ্নই ছিল না সত্তরের লবণহ্রদে। তারপরে আস্তে আস্তে দেখা গেলো সাপের আবির্ভাব। সত্যিকথা হলো যে সাপের চাষ করলেন সরকার বাহাদুর লবণহ্রদে গ্রীণ ভার্জ সৃষ্টি করে, সবুজরেখাটি টেনে। এতদিন ভেড়ি হতে নির্বাসিত সর্পবংশ নিরাশ্রয় হয়ে দিন কাটাচ্ছিলো কাঁচামাটির গর্তে, আবর্জনায় ভরা খানাখন্দে—এবার সরকার বাহাদুরকে ফণা তুলে সেলাম জানিয়ে আশ্রয় নিল, শক্তমাটির ফাটলে—ভেককুলের সান্নিধ্যে। একটু থেমে বল্লেন, গ্রীণ ভার্জ কি শুধু সাপেরই আড্ডাখানা—ওখানে আশ্রয় পেয়েছে দিনের বেলায় ছিচকে চোর আর রাতের বেলায় নিশি-কুটুম্বের দল।

লবণহ্রদের জোলো হাওয়া শুকিয়ে গেছে তপ্ত বালুর স্পর্শে, ভেড়ির মাছের আঁশটে গন্ধ বেদখল হয়েছে শৌখিন বাবু আর বিবিদের দেহ থেকে ছড়িয়ে পড়া ল্যাভেণ্ডার আর জেসমিনের গন্ধে। ব্লকে ব্লকে গজিয়ে উঠেছে সঙ্ঘ আর সমিতি। নাচে গানে আর অভিনয়ের মহড়া চলেছে শহর লবণহ্রদের প্রতি মহল্লায়। নিয়ন গ্যাসে জ্বালানো বাতির স্নিগ্ধ আলোর নীচে মোজেইক মেঝের ওপর বিচ্ছুরিত রশ্মি চোখ ধাঁধায়। মিশরের কার্পেট, লণ্ডনের কাটলরি, বেলজিয়মের কাট গ্লাস, ইজরায়েলের দেয়াল কার্পেট, প্যারিসের ক্রকারিজ,

আমেরিকার ইলেক্‌ট্রনিক সাজসরঞ্জাম গৃহস্বামীদের রুচির পরিচয় দেয়।

১৯৭২ সালে লবণহ্রদে কংগ্রেসের অধিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার দৃষ্টি পড়লো এই শহরের পত্তনের দিকে—বালুর মাঠের বুক চিরে একদিকে যেমন দেখা দিল বাড়ি একের পরে একে মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে—আর একদিকে শহর লবণহ্রদের স্রষ্টা স্বর্গত বিধান রায়ের স্নেহধন্য প্রখ্যাত বাস্তুশিল্পী ডি, পি চ্যাটার্জির নির্দেশনায় প্রস্তুত হলো সুইমিং পুল।

১৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে দীর্ঘ চার বছরের অবিচ্ছিন্ন চেষ্টায় পরিকল্পনাটি বাস্তবে রূপায়িত হলো। ১৯৭৮ সালের ১লা মে আনুষ্ঠানিক ভাবে এর কাজ শুরু হয়। বি, এফ্ ব্লকে চারিদিকে শ্যামায়মান পরিবেশের মধ্যে স্থাপিত এই সুইমিং পুল নবাগত পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সুইমিং পুলের একপাশে রয়েছে ক্লোরিনেশন যন্ত্র জলের সম্ভাব্য দূষিত পদার্থ বিনাশের জন্যে, আর একপাশে আছে পরিশ্রুত যন্ত্র জলাশয় আবর্জনা মুক্ত করার জন্য। অনেকের মতে এইটেই হলো কলকাতার মধ্যে সর্বাঙ্গ সুন্দর সুইমিং পুল, এবং বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে পরিচালিত। সরকার সুইমিং পুলের কার্য পরিচালনার জন্য ভারতীয় লাইফ সেভিং সোসাইটিকে ভার দিলেন। এই সোসাইটি স্থানীয় নবপ্রতিষ্ঠান বিধান নগর সন্তরণ সঙ্ঘের মাধ্যমে এর দৈনন্দিন কার্য নির্বাহ করবেন।

প্রথম বছরেই এর সক্রিয় সভ্যসংখ্যা দাঁড়ালো প্রায় ১৩০০, প্রশিক্ষণের জন্য ছয়জন পেশাদার শিক্ষক—তিনজন স্ত্রী আর তিনজন পুরুষ নিযুক্ত হলো।

সুইমিং পুলে শুধু সুইমিংই হয় না—সাঁতারের জলাশয় ভরে ওঠে, জলতরঙ্গে নেচে ওঠে আলোর হিল্লোলে জলকল্লোলে—জেগে ওঠে পরিচালকদের অন্তরে নিত্য নতুন ভাবধারা, এর চির নবীন সম্পাদক শ্রী পি, কে, মুখার্জীর নির্দেশে রচিত হয় চোখ ধাঁধানো, মনমাতানো অনুষ্ঠান সূচী। ১৯৭৯র ১লা মে C.L.T. পরিবেশন করলেন রামায়ণ।

এই বছরই অনুষ্ঠিত হলো রবীন্দ্রনাথের 'সাগরিকা' ডঃ অজিত ঘোষের প্রযোজনায়। জল নৃত্যনাট্য 'সাগরিকার' সার্থক পরিবেশনে অনুপ্রাণিত হয়ে পরের বার ১৯৮০তে এঁরা রূপায়িত করলেন দ্বিতীয় জলনৃত্যনাট্য 'চণ্ডালিকা'—আর সঙ্গে থাকলো ঈশপস্ ফেবল্‌সের ভিত্তিতে লিখিত সম্পাদক শ্রী পি, কে, মুখার্জীর 'ঐক্যের সন্ধানে।'

আশীতিপর বৃদ্ধ প্রখ্যাত সাঁতারু শ্রী প্রফুল্ল ঘোষ তাঁর জীবনের শেষ সাঁতারের স্মৃতি রেখে যান আমাদেরই এই লবণহ্রদের সুইমিং পুলে।

সন্তরণ সঙ্ঘ শুধু সন্তরণ নিয়েই নিজেদের বিব্রত রাখেন না, এদের কর্মসূচীর মধ্যে স্থান পেয়েছে নানারঙের খেলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এরা ছড়িয়ে দিয়েছে বিধান নগরের সর্বস্তরের বাসিন্দাদের মধ্যে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি। বিশেষ করে এদের সঙ্ঘ দ্বারা অনুষ্ঠিত জল নৃত্যনাট্য বা ওয়াটার ব্যালে, পৃথিবীর উন্নতমান দেশগুলিতে সার্থক হয়ে উঠেছে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকেই। কিন্তু আমাদের নবজাত এই শিশু শহরটিতে জল নৃত্যনাট্যকে সার্থক করে তোলার পিছনে রয়েছে সম্পাদক ও তাহার সহযোগীদের অক্লান্ত ও অশ্রান্ত প্রচেষ্টা এবং শিশু-শিল্পীদের প্রাণঢালা প্রয়াস।

ভেড়ির ওপর বাড়ি করেছি—তাই ভেড়ি চোখে দেখার এক উদগ্র বাসনা মনের মাঝে সর্বসময় উঁকিঝুঁকি মারে– প্রথম ভেড়ি দেখলাম ঝিলমিলের উচু ঢিবির ওপর দাঁড়িয়ে বেশ খানিকটা দূর থেকে। তাই সেদিন শনিবার সকালে শীতের ঝিলমিলে রোদের মাঝে যাত্রা করলাম ভেড়ি দর্শনে। এস ১৬এ চেপে নামলাম খালপুরের স্টপেজে—সেখান থেকে ৩৫বি বাসে চেপে নামলাম সি, আই, টি বিল্ডিং এর শেষ স্টপেজে। তারপরে পথচারীর নির্দেশে এগিয়ে গিয়ে কাঁচা রাস্তায় পড়লাম, তার একদিকে সি, আই, টির চারতলা বাড়ী কলকোলাহলে পূর্ণ আর একদিকে প্রায় ১ কিলোমিটার লম্বা কচুরিপানার আস্তরণের নীচে ঝিমিয়ে পড়ে আছে অতি অগভীর জলাশয়—তার ওপর দিয়ে এক নড়বড়ে সাঁকো—সেটা পার হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম চিংড়ীহাটাটা

কোথায়। এক সাইকেলযাত্রী জ্ঞান দেবার সুযোগ পেয়ে সাইকেল থামিয়ে জানিয়ে দিলেন যে আমি চিংড়ীহাটায়ই দাঁড়িয়ে আছি।

ভদ্রলোক বুঝিয়ে দিলেন ধৈর্য ধরে যে কলকাতার বাল্যজীবনে রাস্তার নাম হতো সাধারণ লোকের নামে কারণ তখনও গণ্যমান্যরা বেশীর ভাগই জীবিত। উদাহরণ—ছিদাম মুদির গলি, ছকু খানসামার গলি, অখিল মিস্ত্রী লেন, শ্যামা বাই এর গলি, আবার কতক নাম হতো বাজারের নামে। যেমন শ্যামবাজার, রাধাবাজার, বাগবাজার, বড়বাজার, বৌবাজার ইত্যাদি। আবার গাছের নামও আছে অনেক বটতলা, নিমতলা, সিমলেপাড়া। আবার জাতব্যবসার নামেও ছিল অনেক রাস্তার পরিচয়—কলুটোলা, আহিরিটোলা, পটুয়াটোলা, কুমারটুলি, হাড়িপাড়া, দর্জিপাড়া, ধোবাপাড়া, তেলিয়াপাড়া ইত্যাদি।

সঙ্গে সঙ্গে বুঝিয়ে দিলেন যে ঠিক একই পন্থা অনুসরণ করে ভেড়ির আশেপাশের অর্থগুলোর নাম হয়েছে চিংড়িহাটা, বেলেঘাটা, তপসিয়া, ট্যাংরা ইত্যাদি।

ভেড়ি থেকে ধরে আনা হতো ঝুড়ি ভর্ত্তি করে চিংড়ি, জমতো পাহাড়, নিলাম হতো মাছের ঢিবির। কখনও নিলাম হতো কুইন্টাল হিসাবে। ওজন করা হতো মাছের কাঁটায়, ভোর চারটে থেকে ৬ টার মধ্যে বেচাকেনা শেষ হয়ে যায়, তারপরে পড়ে থাকে মাছের গন্ধ আর মাছের কিছু আঁশ। চিংড়িহাটা নাম হয়েছে চিংড়ি থেকে। বেলেঘাটার নামকরণ হয়েছে বেলেমাছ থেকে। আর ট্যাংরার বিস্তৃত বসতি নামধারণ করছে ট্যাংরা মাছের জন্য। আবার তেমনি করেই নাম হয়েছে তপসিয়ার, তপসে মাছ থেকে। তখনকার দিনে সাহেব মেমের জিভে জল আসতো তপসে মাছের নামে—কলকাতা বন্দরে জাহাজ নোঙর করার সঙ্গেই স্বপ্ন দেখতো তপসে মাছের ফ্রাইএর। এখন আর সেই আগের মতো ভেড়ির প্রতাপ নেই, প্রতিপত্তিও নেই—সব শুষে নিয়েচে বালুর মাঠ—শহর লবণহ্রদের ভিত্।

ভেড়িতে যখন পৌঁছালাম, তখন সেখানে আলাপ হলো পাগলাডাঙ্গার

ভূতোর সঙ্গে। ভূতোর বগলে একটা ট্র্যান্সিষ্টর, কব্জীতে একটা ঘড়ি, পরনে লুঙ্গি, গায়ে মার্কিনী শার্ট, পায়ে হাওয়াই চপ্পল। ভূতো দুঃখ করে বল্ল যে, এখন আর ভেড়ির সেই আগের জৌলুস নেই। ভেড়িতে রুইকাতলার জায়গায় এখন চাষ হয় তেলাপিয়ার, আমেরিকান রুইএর। আমেরিকান ডলারের মতোই আমেরিকান কই ছড়িয়ে পড়েছে পৃথিবীর সর্বত্র—লবণহ্রদ তার ব্যতিক্রম হতে পারে না।

ভেড়ির মাঝখানে রয়েছে দুটি আলা, একটা ছোট্ট নৌকা বাঁধা আছে ঘাটেতে, আলাতে যাতায়াত করার জন্যে। ভেড়ির পারে একটি খালি মাটির জালা পরে রয়েছে—সেটি দেখিয়ে ভূতো বল্ল ওটাতে তৈরী হয় চোলাই মদ। এই চোলাই মদের ব্যবসাতে হাত পাকিয়েছে একদল লোক। রাতের অন্ধকারে চলে তাঁদের কারবার দিনের বেলা বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকে। একটু চোঁক গিলে কৈফিয়তের সুরে বল্ল যে কি করবে লোকগুলো, চাকরীবাকরী নেই, এই করেই দিন চালায়। আমাদের 'এ, ই,' ব্লকের এক বন্ধুব বাড়ি ডাকাতি করতে এসেও ঠিক ওই কথাই বলেছিল "দেখুন আমরা বেকার, ওই ডাকাতিই আমাদের পেশা, আপনারা যদি ভদ্রভাবে আমাদের সহযোগিতা করেন, আপনাদের যথাসর্বস্ব আমাদের দিয়ে দেন তবে আমরাও ভদ্রলোকেব মতোই বিদায় নেবো, আর যদি অন্যথা করেন, তবে গুলি, বোমা দেখতেই পাচ্ছেন।"

পাগলাডাঙ্গার ভূতো দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে দর্শনের কথা আওড়াতে শুরু করলো "মানুষ জন্মেছে ক্ষিধে সঙ্গে করে—এরজন্য সেতো দায়ী নয়। আপনারা যদি তাদের ক্ষুধার অন্ন না যোগাতে পারেন, তবে তারা কুকাজ করেই জীবিকা নির্বাহ করবে, এছাড়া উপায় কি?" মোক্ষম সত্যি কথা—সত্যি তো, উপায় কি? হয়তো জাঁ জেকস্ রুশো এই কথাটই ঘুরিয়ে বলেছিল তার Social Contract এ যেটা ফরাসী বিপ্লব আনতে সাহায্য করেছিল—বিশ্বের দরবারে ত্রাসের সঞ্চার করেছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলা সবেমাত্র শেষ হয়েছে। লক্ষ লক্ষ

মাতৃহারা, পিতৃহারা গৃহহারা শিশুর নিরন্তর ক্রন্দনে আকাশ বাতাস ধ্বনিত হচ্ছে, অসহায় সম্বলহীন শিশুদের বেদনার করুণ কাহিনী আঘাত হানলো কত মানুষের অন্তরে। কেউ সাড়া দিল, কেউ দিল না। যারা শিশুর ক্রন্দনে সাড়া দিল তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন অষ্ট্রিয়ার ডঃ হারম্যান মাইনার। ১৯৪৯ সালে যুদ্ধবিধ্বস্ত বিশ্বের অগণিত অনাথ শিশুদের সর্বাঙ্গীন সাহায্যকল্পে নিজেকে উৎসর্গ করলেন সম্পূর্ণভাবে। প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললেন সারাবিশ্বে—নামকরণ হলো SOS—এস, ও এস। ৩০ বৎসরও পূর্ণ হয়নি এরই মধ্যে বিশ্বের ৫৯টি দেশে এই প্রতিষ্ঠানটি সাদর আহ্বান পেয়েছে। ১৯৭৫ এ সল্টলেক এ জমি দিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার—অর্থ যোগালেন পশ্চিম জার্মানীর সারল্যাণ্ডের টি. ভি. ষ্টেশনের কর্ম্মীরা আর পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে এলেন অষ্ট্রিয়ার ডঃ হারম্যান মাইনর—SOS এর জনক। পশ্চিম বাংলা, পশ্চিম জার্মানী আর অষ্ট্রিয়া—বিশ্বের বুকে ছড়িয়ে পড়া তিনটি দেশের ভাবধারা মিলিত হলো সল্টলেকের বুকে—উদ্দেশ্য সেই একই, শিশুর মুখে হাসি ফোটানো, বেদনার অশ্রু মুছিয়ে দেওয়া। ১৯৭৭ সালের ১লা জানুয়ারী ২০টি মহিলা এলেন অনাগত শিশুদের মায়ের স্থান দখল করতে শিক্ষানবিশী হিসাবে। এদের শিক্ষা দেওয়া হলো ১২ সপ্তাহ ধরে। ফেব্রুয়ারী মাসে হাজির হলো ১৬টি শিশু—আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পেয়ে এক বৎসরে শিশুর সংখ্যা পরিকল্পনা অনুসারে দাঁড়াবে ২০০তে। সল্টলেকের SOS এর প্রাণপুরুষ হলেন ডাইরেক্টর শ্রীসুজিত মিত্র আর তাঁকে শক্তি যোগান তাঁব সুযোগ্য সহধর্মিনী শ্রীমতী লক্ষ্মী দেবী।

২০টি নবনির্মিত গৃহে SOS সীমানার মধ্যে ২০জন মায়ের স্নেহ-চ্ছায়ায় এই শিশুরা আপন ঘর খুঁজে পাবে। SOS একটি আন্তর্জাতিক বিশ্বসংস্থা—এর কেন্দ্রগুলি ছড়িয়ে আছে বিশ্বের একপ্রান্ত হতে অপর প্রান্তে—অবজ্ঞাত, উপেক্ষিত, অনাদৃত হাজার হাজার শিশুর ভরসা এই প্রতিষ্ঠান, তার কল্যাণহস্ত সদা প্রসারিত নিরাশ্রয় শিশুদের কোল দেবার জন্য—মাতৃস্নেহ স্পর্শে ধন্য করে দেবার জন্য।

বলিভিয়ার কোভাবাম্বা গ্রামে, সালভারিনা এল সালভাজোরের সোনসোনেট গ্রামে, অষ্ট্রেলিয়া, সেন্ট্রাল আমেরিকার ম্যানাগুয়ার এল্সিজিও, ফিনল্যাণ্ডের ইলিটোনিও গ্রামে রুস্কিনো, টোগোর-নামবারা গ্রামে ও ইরিন্সু, সায়গনের গোভ্যান গ্রামে সাইরোমা, এই অগণিত অসহায় দুঃস্থ শিশুরা নির্ভর করে আছে SOS এর করুণাঘন আশ্রয়ের উপর ভারতেও ছড়িয়ে পড়েছে এর প্রভাব। কাশ্মীরের গুলজারই ইটফাল, দিল্লীর বাওয়ানা, রাজস্থানের জয়পুর, মহারাষ্ট্রের সাসোযাও আর পশ্চিম বাংলার সল্টলেক—সবই আশ্রয় দিচ্ছে, নিরাশ্রয় শিশুদের।

সল্টলেকে SOS গ্রামে ২০০ শিশু ২০ জন মায়ের অধীনে নতুন জীবনের আস্বাদ পাবে—দেখতে পাবে ভবিষ্যতের নতুন আলো, নতুন আশা। প্রথম ১৬টি শিশু ২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৭এ সল্টলেকের SOS গ্রামে পদার্পণ করে। ভরে ওঠে লবণহ্রদের বালুর মাঠে SOS গ্রাম হাসিতে, খুশীতে, নবজীবনের আশার আলোতে।

বিংশ শতাব্দীর অষ্টম দশকে হিসাব করলে দেখা যায় এই প্রায় ৩২ বৎসরে SOS গ্রামের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৫০। ৫৯টি দেশের মাটিতে শিকড় গেড়েছে স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতায়, সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায়। ডঃ হারম্যান মাইনরের বিচক্ষণতায় SOS এর শিক্ষা-পদ্ধতি কেন্দ্রে আগত শিশুদের সাহায্য করে স্থানীয় জীবন প্রবাহের সাথে খাপ খাইয়ে চলতে, একটি সুস্থসবল আত্মনির্ভর, স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবনধারণ করতে। SOS প্রতিষ্ঠানের বিধান অনুসারে যে কেউ এই সহায় সম্বলহীন শিশুদের মধ্যে বেছে নিয়ে তার ধর্মপিতা বা ধর্মমাতা হতে পারে। যার পক্ষে এককভাবে সম্পূর্ণ ভার নেওয়া সম্ভব হয় না সে ইচ্ছা করলে দলগতভাবে একটি শিশুর ভার নিতে পারে, দলবদ্ধ-ভাবে শিশুটির সম্পূর্ণ খরচের ভার বহন করে, মাত্র ৮০ টাকা ব্যক্তিগত চাঁদা দিয়ে। শিশুটির ধর্মপিতা হওয়া একটা নৈর্ব্যক্তিক ব্যাপার নয়, দাতা শিশুটিকে গ্রহণ করে আপন সন্তানের মতো। SOS কার্যালয়

ডাক হরকরার কাজ করে শিশু ও তার ধর্মপিতার মধ্যে যোগাযোগ রাখে। শিশুর ধর্মপিতা স্নেহের তাগিদে SOS গ্রামে কাটাতে পারে শিশুটির সঙ্গী হিসাবে। SOS এর মাধ্যমে একটি দুঃস্থ শিশুকে মানুষ করাব বিভিন্ন উপায় আছে। শিশুটির SOS এ জীবন ধারণের সমস্ত খরচা বাবদ মাসিক ৮০টাকা হিসাবে দান করে। শিক্ষার জন্য মাসিক ২৫৲ হিসাবে দিয়ে, শিশুদের বসবাসের জন্য একটি গৃহনির্মাণের খরচ বাবদ এককালীন ৪৫০০ হাজার টাকা দান করে। মাসিক ২৫ টাকা দিয়ে সাধারণ সভ্য হয়ে অথবা মাসিক ৫ টাকা দিয়ে SOS এর বন্ধুতালিকাভুক্ত হয়ে।

আপনি যদি কাঁকুরগাছি ছাড়িয়ে সল্টলেকের দিকে আসেন, তবে সল্টলেক অ্যাপ্রোচ রোডের একটু আগেই দেখতে পাবেন বিধান রায়ের মর্মর মূর্ত্তি। সদাহাস্যময় মূর্ত্তিটি সকলের দৃষ্টিই আকর্ষণ করে। শিল্পী সুনীল পালের সৃষ্ট এই মর্মর মূর্ত্তিটির বাঁদিকে এগিয়ে গেলে দেখতে পাবেন শিশু-উদ্যান।

১৯৬২ সালের ১লা জুলাই বিধান রায়ের অকস্মাৎ মৃত্যুর পর ৪ঠা জুলাই ময়দানে এক জনসভায় বি. সি. রায় মেমোরিয়াল কমিটি আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত হয়। ১৯৭৬ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী রাষ্ট্রপতি ফক্রুদ্দিন আলি আহমদ কর্তৃক বিধান শিশু উদ্যানের উদ্বোধন হয়। ৬৪ বিঘা জমির ওপর শিশু উদ্যানে আছে ১০০ জনের উপযুক্ত একটি রিডিংরুম, ৪৭০ আসন বিশিষ্ট একটি প্রেক্ষাগৃহ, অঙ্কন ও ভাস্কর্য শিক্ষা দেবার জন্য একটি হবি সেন্টার, একটি চড়ুইভাতি কেন্দ্র, আরোও আছে সুইমিং পুল ও খেলাধুলার জন্য প্রশস্ত মাঠ।

শিশু উদ্যান একটি সর্বাঙ্গসুন্দর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। শিশুদের দেহ ও মন যাতে সম্পূর্ণতা লাভ করে দেশের বৃহত্তর সমাজের ও পরিবারের কল্যাণে যাতে নিজেকে গড়ে তুলতে পারে তার সবরকম সুযোগ দেওয়া হয় এই শিশু উদ্যানে।

শিশু উদ্যানে সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয় স্বাধীনতা দিবস, গান্ধী জয়ন্তী,

বিশ্ব শিশু দিবস, নেতাজী জন্মোৎসব, কবিগুরু রবীন্দ্র জন্মবার্ষিকী। প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় একদিকে যেমন নৃত্যগীতের, অন্যদিকে তেমনি খেলাধূলার— এছাড়া পড়াশোনায় উৎসাহ দেবার জন্যে রয়েছে বেশ কয়েকটি বৃত্তির ব্যবস্থা।

আগেই বলেছি যে মূল ঘরের মালিক শ্রীজিতেন চক্রবর্তী (এ. বি.) শহর লবণহ্রদের মূল বাসিন্দা। ওঁর বাড়ীর নামটা সার্থক হয়েছে— বাংলাদেশে ফেলে আসা ওঁর গ্রামের নামও 'মূলঘর'। দ্বিতীয় বাসিন্দা হলেন শ্রীশরদিন্দু চ্যাটার্জ্জি। তৃতীয় ব্যক্তি লবণহ্রদে বাস করতে আসেন শ্রীগিরিজামোহন সেনগুপ্ত এ. এ. ব্লকে—উল্টোডাঙ্গার মুখে।

চতুর্থ বাসিন্দা হলেন ডাঃ বি. রায়। এই ব্লকে তাঁরই হলো প্রথম বাড়ী। পুরোণো লবণহ্রদের গল্প শুনতে গেলাম তার বাড়ীতে। ডাঃ রায়ের স্ত্রী ও তাঁর মেয়ে গল্পে যোগ দিলেন ডাঃ রায় হার্টের রুগী, তাঁকে বেশী কথা বলতে নিষেধ করা হলো—বেশী কথা বল্লেন ডাঃ রায়ের স্ত্রী। তাঁর মেয়ে মাঝে মাঝে মার কথা পূরণ করে দিচ্ছিলো।

শহর লবণহ্রদের প্রথম দুর্গাপূজা হয় ডাঃ রায়ের বাড়ীতে—অবশ্য এটা বাড়ীর পূজা। প্রথম বারোয়ারী দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয় নাগরিক সমিতির দ্বারা।

মিসেস্ রায় প্রশংসায় পঞ্চমুখ সি. আর পির ৩৪ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক মেজর চাকোয়ালের। প্রথমবার যখন দুর্গাপূজার অনুষ্ঠানে ব্যতিব্যস্ত—লোক নেই, জন নেই, হাট নেই, বাজার নেই, তখন ষষ্ঠীর দিন সকালে মেজর চাকোয়াল কর্মচারীদের সঙ্গে নিয়ে হাজির ডাঃ রায়ের দরবারে দুর্গাপূজায় যোগদানের অনুমতির জন্য। সানন্দে অনুমতি দিলেন ডাঃ রায়—দেখতে দেখতে তার বাড়ীর পূজা মূর্তি নিল বারোয়ারী পূজার—চাকোয়াল তাঁর সৈন্যসামন্ত নিয়ে লেগে গেলেন কর্মমঞ্চে—ডাঃ রায়ের বাড়ীর সামনে বিস্তৃত জায়গা জুড়ে পড়লো ত্রিপলের আস্তরণ।

মাথার উপর তুলে ধরা হলো সামরিক সামিয়ানা—আকাশ বাতাস প্রতিধ্বনিত হলো ধর্ম-সঙ্গীত আর লোকসংকীর্তনে। বেজে উঠলো

ঢাক-ঢোল কাড়ানাকাড়া, উৎসবে প্রসাদ পেলো উড়িয়া, বিহারী, গুজরাটী, মারাঠী, পাঞ্জাবী, নেপালী। সে এক বিরাট সমারোহ। শহর লবণহ্রদের এ-ই ব্লকে প্রথম দুর্গাপূজা হলো বি, রায়ের বাড়ীতে—পূজা প্রাঙ্গণে মায়ের বেদীতে অর্ঘ্য দিল সর্ব-ভারতীয় ভক্তরা।

এ, ই ব্লকে তখন জাঁকিয়ে বসেছে শ্যামলের চায়ের দোকান আর দুলালের চোরা কারবার। ডাঃ রায় দুলালকে রাখলেন দারোয়ান—যাতে দুলালের মাসতুতো ভাইরা উপদ্রব না করে। ডাঃ রায় মন্তব্য করলেন, দুলাল অন্য চোরকে আসতে দিত না কিন্তু নিজে চুরি করে পয়সা করতো।

মিসেস রায় বললেন যে ভেড়ি ভরাট হয়ে যাওয়াতে ভেড়িকে ঘিরে যে মদের চোরা কারবার চলতো, সেগুলো রয়েই গেলো উঠতি শহরের আনাচে কানাচে।

এই প্রসঙ্গে একটা মজার গল্প বললেন—তাঁর বাড়ীর পিছনে একটা গর্তর মধ্যে দেখা গেলো একটি চক্‌চকে প্লাষ্টিকের ব্যাগ রোদে ঝিক্‌মিক্‌ করছে। তখন বালুর মাঠে নক্সালদের আধিপত্য ছিল প্রবল। বাগুইহাটি, কেষ্টপুর আর দক্ষিণদ্বারীর নক্সালরা পুলিসের তাড়া খেয়ে পালাতো লবণহ্রদের বালুর মাঠের মধ্যে দিয়ে। তাই তাঁরা ধরেই নিলেন যে ব্যাগের মধ্যে লুকিয়ে আছে মারাত্মক বোমা। খবর দিলেন সি আর. পির অধিনায়ক শ্রীচাকোয়ালকে ক্যাম্প থেকে ছুটে এলো তাগড়া তাগড়া জোয়ানরা—সঙ্গে নিয়ে এলো লম্বা লম্বা বাঁশ—খুঁচিয়ে তুল্ল সে বিরাট ব্যাগের বোঝা—পিছলে পড়ে গেলো মাটিতে। দেখা গেলো ব্যাগে ভরা বোমা নয়—ফুটবলের ব্লাডারে ভরা চোলাই মদ, মদের গন্ধে সচকিত হলো জোয়ানরা—কিন্তু উপায়হীন এক চুমুকে শুকে নিল ধরিত্রীর বুকে জমা থাকা বালুর কণাগুলি। ধরা পড়লো এক গোর্খা জোয়ান, চোলাই মদ চালানের অপরাধ—আছড়ে পড়লো মিসেস্ রায়ের চরণপ্রান্তে, রেহাই পেলো কঠিন শাস্তির হাত থেকে মিসেস্ রায়ের সালিশীতে। এমনই মধুর ছিল সম্পর্ক শহর লবণহ্রদের তৃতীয় বাসিন্দা

রায়ের সঙ্গে সি. আর. পির ৩৪ ব্যাটালিয়ানের অধিনায়ক মিঃ চাকোয়ালের।

১৯৭২ সালে কংগ্রেসের অধিবেশনের সময় প্রথম একটা পাব্লিক বাস দেখা যায় শহর লবণহ্রদের বুকে—দু-একজন যারা উপস্থিত ছিলেন এই অভিনব দৃশ্য দেখার জন্য, তাঁরা শঙ্খ ও হুলুধ্বনির দ্বারা স্বাগত জানাল অষ্টচক্র যানটিকে, কিন্তু পরের দিনই তাদের ভুল ভাঙ্গল যে এই যন্ত্রচালিত রথটি এসেছিলা ক্ষণিকের জন্য চোখ ধাঁধাতে--দ্বিতীয় বার আর তাকে দেখা যায় নি।

ভি. আই পি. রোডের পায়ে চলা ব্রীজটি হয়েছিলো কংগ্রেস অধিবেশনের আগত রথী মহারথীদের অভ্যর্থনার জন্য—তার আগে ছিল উল্টোডাঙ্গার কাছাকাছি একটি দড়িটানা নৌকার ব্যবস্থা পারাপার হবার জন্য। ভাবা এ্যাটমিক ইনষ্টিটিউটের কাছে ছিল খেয়াঘাট—সেটা এখনও আছে, তবে ওই ছোট খালটুকু পার হতে লাগত প্রায় ২০।২৫ মিনিট, কচুরি পানার সঙ্গে অনেক ধস্তাধস্তি করে তবে পারাপার চলতো।

ইন্দিরা গান্ধী আসবেন কংগ্রেস অধিবেশনে দমদম এয়ারপোর্ট থেকে---পায়ে চলা ব্রীজের ওপর দিয়ে গাড়ী চলে না উল্টাডাঙ্গা দিয়ে আসতে অনেক সময় লাগে—তাই সল্টলেকের সি. আর. পির ৩৪ ব্যাটেলিয়নকে কাজে লাগানো হোল—দেখতে দেখতে কৃষ্ণপুর খালের ওপর তৈরী হলো একটি ছিমছাম কাঠের পন্টুন ব্রীজ—ইন্দিরা গান্ধীর জন্য। সল্টলেকের সঙ্গে বহির্জগতের যোগসূত্র গাঁথা হলো পন্টুন ব্রীজের মাধ্যমে।

খেয়াপার হয়ে ওপারে দেখা যেতো লালকুঠী আর এপারে হলো ভাবার ইনষ্টিউট। লালকুঠীর কোনও অস্তিত্ব নেই—বেঁচে আছে শুধু ভি. আই. পি. রোডের বাস কণ্ডাক্টরের মুখে বাসস্টপেজ হিসাবে।

১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই অক্টোবর গঙ্গাসাগর থেকে এক প্রলয়ঙ্কর ঝড় উঠেছিল, সঙ্গী ছিল তার ভূমিকম্প। সমস্ত কলকাতাকে ছারখার করে দিয়েছিল—অধিকাংশ বাড়ী হলো ভূমিস্যাৎ। গঙ্গার বুকে যে

সব জাহাজ ছিল তার অধিকাংশেরই হলো সলিল সমাধি—বড় বড় নৌকাগুলো গেল ডুবে আর ছোট ছোট নৌকাগুলিকে উড়িয়ে নিয়ে তুললো গাছের চূড়োয়—সেণ্ট জন চার্চের চূড়াটি আর গোবিন্দলাল মিত্রের আকাশছোঁয়া নবরত্নের মন্দিরের চুড়া হলো ধূলিস্যাৎ।

শহর লবণহ্রদের উপরও এক ভয়ঙ্কর ঝড় দেখা দিল ১৯৭২ সালে, কেষ্টপুর খালের ওপর থেকে আকাশের বুক চিড়ে আসতে লাগলো বড় বড় ড্রাম—ঝুপঝাপ করে পড়তে লাগলে শিলাবৃষ্টির মতো। ভাগ্যিস্ তখন বালুর মাঠে ছিল শুধু রাশি রাশি বালি। বালুর ঝড়ে আচ্ছন্ন হলো আকাশ, আর খালপাড়ে আছড়ে পড়ল এক বিরাটকায় তেঁতুল গাছ আর ভেঙ্গে পড়লো ভাবা ইনষ্টিটিউটের ৫২ ফিট উঁচু চূড়াটি। মেজর চৌধুরী ছিলেন সি. আর পি. শিবিরের অধিনায়ক। তিনি বেরিয়ে এলেন লোকলস্কর নিয়ে ধ্বংসস্তূপের সৎকার করলেন তার পুলিশ বাহিনীর সাহায্য নিয়ে।

১৯৭৬-৭৭ সালের লবণহ্রদের পোষাক পরিচ্ছদের বিচিত্র সমাবেশ—নক্সাদার সংমিশ্রণ। বিশ্বের পঞ্চম শহর কলকাতা, পোষাক পরিচ্ছদে, সাজে সজ্জায়, বর্ণে বৈচিত্র্যে। বিলাস ব্যসনে এক অপরূপ শহর—তারই পাশে শহর লবণহ্রদ ধীরে সঙ্কোচে একটু একটু করে এগিয়ে চলেছে।

শহরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে একদিকে যেমন পাকাবাড়ী মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে আবার অন্যদিকে মাঠে ময়দানে, খোলা জায়গায় সর্বত্র কাশফুলের হিল্লোল, আনাচে কানাচে ঘেঁটুফুলের ছড়াছড়ি, একদিকে পিচের রাস্তা, আবার পিচের রাস্তার আস্তরণ ভেদ করে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে কচিঘাসের গোছা—একদিকে দোতলা বাড়ীর জানালা দিয়ে বের হচ্ছে এমারজেন্সি লাইটের ঝিলিক্ আবার অন্যদিকে লণ্ঠন হাতে চলেছে ঝোপরিির ঘনশ্যাম গুছিয়া হারানো গুরুটির সন্ধানে। খালের পারের রাস্তা দিয়ে হাঁকিয়ে যাচ্ছে ফিয়েট ১২৪ এর জৌলুস আর খালের বুকে খড় বোঝাই নৌকা ভেসে যাচ্ছে জালিম মিঞার গুণ

টানায়। বাঁকে করে দই হাঁকছে নিতাই গোয়ালা আর অ্যাম্বেসেডর গাড়ীতে মাইক বসিয়ে বিজ্ঞাপন দিচ্ছে ইলেকট্রনিক্স্ মেরামতের।

মাথার ওপর ছালার চট, মাটিতে ছেঁড়া মাদুর, মাথুর গাইছে কীর্ত্তনীয়ারা খোলকরতাল সঙ্গত রেখে—পাশের বাড়ীর জানালা দিয়ে ভেসে আসছে নিউইয়র্কের বিল ও স্টিট্ জেরমির উগ্র সঙ্গীত আর জাজ নৃত্যের উদ্ধত তাল। এ বাড়ীর আধুনিকা ভরত নাট্যম বোলের সাথে মেয়েকে শেখাচ্ছেন নৃত্যের তাল আর ও বাড়ীর বিদেশ ফেরৎ কর্ত্তা ফক্সটেরিয়ারের চেন হাতে ছেলেকে রপ্ত করাচ্ছে ফক্সট্রট। ক্ষুধার্ত্ত কালকেউটের বাচ্চা তাড়া করছে অসহায় ব্যাঙের পেছনে, আবার বিরাট অ্যালশেসিয়ান ধাওয়া করেছে হুলো বেড়ালকে। মহাপ্রভুর ক্ষীর মোয়া আর রসকদম্বের সাথে স্পেন্সারের পেষ্ট্রিজ আর কেক। চওড়া লাল পেড়ে শাড়ীপরা ঠাকুমার সাথে চলেছে ম্যাক্সিপরা নাতনী। ঘোমটা পরা ঘরণীর সামনে চলেছে উগ্রমূর্ত্তি মহিলা। পাটিসাপটা পিঠের পাশে নিউমার্কেটের ক্রীমরোল। লবণহ্রদ বিচিত্র এই সংমিশ্রণের মধ্যেই বেড়ে চলেছে ধাপে ধাপে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দশকে কলকাতায় লোক চলাচলের জন্য রাস্তা ছিল মাত্র দুটো। ছোটগলির সংখ্যাও ছিলো মাত্র দুটো—পাকা বাড়ী ৮টা, মেটেবাড়ী আট হাজার। ওই শতাব্দীর পঞ্চম দশকে পাকাবাড়ী হলো ৪৯৮, মোট বাড়ী ১৪৫০০, রাস্তা ২৭টা, গলি ৫২টা আর পুকুর ১৩টা।

শহর লবণহ্রদে বিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশকের প্রথমে পাকাবাড়ী ছিল ৫টি, বেনাপড়ি ছিল ১৫০টি, ভেড়ি ছিল ২৩টি চিংড়িহাটায় ও বর্তমানের ঝিলমিলের কাছে। আর এই শতাব্দীর আট দশকের প্রথম বছরে লবণহ্রদে বাড়ীর সংখ্যা দাঁড়ালো প্রায় ৪ হাজার, পুকুর হলো ২টি। ১৯৮১ সাল ৮ই জানুয়ারী, অ্যাডভাইসরী বোর্ডের কাছ থেকে খবর পাওয়া গেল যে আজ পর্যন্ত শহর লবণহ্রদের বাড়ীর সংখ্যা হচ্ছে ৩৪৪১ আর ফ্ল্যাটের সংখ্যা ২০৮৪। সর্বসাকুল্যে আবাসের সংখ্যা

৫৫২৫। বাড়ীগুলোর এক-একটি তলাকে যদি এক একটি ফ্ল্যাট ধরা যায়, তবে ফ্ল্যাটের সংখ্যা দাঁড়াবে আনুমানিক আট হাজার। এই আট হাজার ফ্ল্যাটের ছাতের নীচে বসবাস করছেন প্রায় ৪০ হাজার লোক অর্থাৎ গড়পড়তা একটি ফ্ল্যাটের বাসিন্দা হলো প্রায় ৫ জন। বিদ্যাসাগরে এই গড়পড়তা সবচেয়ে কম আর বৈশাখী আবাসনে এটা সবচেয়ে বেশী।

পুরানো কলকাতার বাসিন্দাদের মধ্যে দেখা যায় শেঠ, বসাক, মল্লিক আর কুশারীদেরই দাপট বেশী ছিল—সঙ্গে ছিল পাঞ্জাবী ব্যবসায়ী মুলুকচাঁদ আর হুজুরমলের দল।

খাস বাঙালীরা বাস করতেন সুতানুটিতে—চাটুজ্জে, বাড়ুজ্জ্যে, মুখুজ্জ্যে, ঘোষ, বোস, সোম, কর, ধর, সরকার, দে, দত্ত, সেন, রায় আরও কত কি।

তবে মানসম্মান একচেটিয়া ছিল সোনার বেণের ও পিরালীবামুনের আর কায়স্থ ও তাঁতীদের মধ্যেও ছিল বহু গণ্যমান্য।

১৯৭৮ থেকে লবণহ্রদে বাসের ভীড় বাড়তে আরম্ভ করলো—অফিস টাইমে তো ঝোলাঝুলি শুরু হয়ে গিয়েছে। যে কোন বাসের ভীড়ে যদি একটু চোখ মেলে তাকিয়ে দেখেন আর সবার পদবী যদি অন্তত জানা থাকে, তবে দেখা যাবে যে বাসের একপ্রান্তে কুশারী, অপরপ্রান্তে ভাদুড়ি, মাঝখানে চ্যাটুজ্জ্যে, বাড়ুজ্জ্যে, মুখুজ্জ্যে গিজগিজ করছে। ঘোষ, বোস, গুহ মিত্তিরের দলও কম যায় না। ছিটেফোঁটা সেনগুপ্ত, দাশগুপ্ত, চৌধুরীও পাবেন। খোঁজ করলে পাবেন নন্দী, পাবেন গড়াই।

ভারতের রাজধানী দিল্লীতে দেখেছি বাড়ীর মালিক পাঞ্জাবী আর বাস করে বাঙালী ভাড়াটে। শহর লবণহ্রদের বাড়ীর মালিক বাঙালী আর ভাড়াটে হলো মাড়োয়ারী আর মাদ্রাজি। তাই বাসের ভীড়ে খেয়াল করলে দেখতে পাবেন পেট মোটা মাড়োয়ারী, গোঁফে তা দেওয়া মাদ্রাজী, পাগড়ী বাঁধা সর্দারজী—সব দেশের লোকই এখানে হাজির হয়েছে এবং বাস করছে খোসমেজাজে।

সত্তরের দশকে লবণহ্রদ

৭২-৭৩ এ যখন লবণহ্রদের বিস্তৃত এলাকা জুড়ে বাড়ীর সংখ্যা ছিল ছিটেফোঁটা হাতে গুণে প্রায় শেষ করা যায়, তখন এখানে না ছিল ডাকাত, না ছিল চোরের উপদ্রব। কোন রকমে মশাকে বাগে আনতে পারলে, গৃহস্বামী নিশ্চিন্ত আরামে দিন কাটাতে পারতেন। সন্ধ্যার পর শেয়ালের ডাক আর সাপের ফোঁসফোসানি শোনা যেত— মস্তানী আর ছিনতাই, এ এলাকায় তখন অপরিচিত ছিল।

১৯৭২ সালে পায়ে হাঁটা ব্রীজ খুলে দেওয়া হলো, ভি আই পির সঙ্গে সংযোগ হলো লবণহ্রদের। কলকাতার যাতায়াত পথে লোকে এদিকে একবার না তাকিয়ে পারতো না। যেমন ছিল এর শ্রী, তেমনি ছাঁদ। বিনা কারণেও অনেকে একবার এর ওপর দিয়ে হেঁটে যেতো অভিনবত্বের আকর্ষণে, কিন্তু আজ ১৯৮০ সালের দিকে একবার চেয়ে দেখুন কি তার দুরবস্থা। কোথায় গেলো সেই টুপি পরা আলোর মালা —কোথায় গেলো সেই উপছে পড়া আলোর ধারা—কোথায় সেই মনমাতানো রঙএর বাহার। এখন এই ব্রীজটি হয়েছে লবণহ্রদের আতঙ্ক। সন্ধ্যার অন্ধকার ঝিমিয়ে পড়ে হয়তো অতীতের স্মৃতির ভারে। কোথায় উধাও হয়ে যায় আলোর সাজ সরঞ্জাম? কার অদৃশ্য হস্তের সুনিপুণ কৌশলে আলোক অন্ধকারে পরিণত হয়? উত্তর কোথায় পাওয়া যাবে? কেউ সন্ধান দিতে পারেন?

এই ব্রীজের আনাচে কানাচে ওৎ পেতে থাকে ছিনতাইকারী, মস্তানের দল, ত্রাসের সঞ্চার করে পথিকদের মনে—সন্ধ্যার পরে ডাকাতরা আসে অভিসারে ঐশ্বর্যের লালসায়। সেদিন সন্ধ্যায় শ্রীহালোই-এব বাড়ীতে হল ডাকাতি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে কলকাতায় বিশ্বনাথবাবু পাল্কী চড়ে ডাকাতি করতে আসতেন। অতিথি আপ্যায়নের সুযোগ হতে গৃহস্থ যাতে বঞ্চিত না হয় তার জন্য চিঠি লিখে জানিয়ে আসতেন। এঁরা এলেন সন্ধ্যার স্তিমিত আলোয়—বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে হয়তো কিছুক্ষণ গৃহস্বামীর অফিস হতে প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায় রইলেন। এরই মধ্যে চলছিল চিরাচরিত লোডশেডিং। ডাকাতি শেষ হবার

পর সজাগ হল গৃহস্থ। এল পুলিশ, সজাগ হল প্রতিবেশীবৃন্দ। মশামাছির আনাগোনা যত কমছে—চোর ডাকাতের যাতায়াত তত বাড়ছে। রাস্তাঘাট যত জমজমাট হয়ে উঠছে, ছিনতাইকারী আর মস্তানদের হচ্ছে তত রমরমা।

এ. ই. ব্লকের সমাজ কল্যাণ সঙ্ঘ গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালো—সভা আহূত হলো। বক্তৃতার দাপটে অনেকে চমৎকৃত হলো, শোভা-যাত্রার প্রস্তাব রাখা হলো, যারা বুদ্ধিমান তারা প্রস্তাবকারীদের নির্বুদ্ধিতা সপ্রমাণ করে ঝঞ্ঝাট থেকে সরে দাঁড়ালো, তবু শোভাযাত্রা হাজির হলো থানায়—কর্তৃপক্ষের আশ্বাস নিয়ে আর পরিশ্রান্তির দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে বাড়ী ফেরা হলো। কিছুদিন ধরে চলল পুলিশের নিয়মিত টহল। আর সন্দেহে ধরে আনা আসামীদের সনাক্ত করার দায়ে গৃহ-কর্ত্তার থানায় তলব কিন্তু পরিশেষে সব চেষ্টাই হলো নিষ্ফল। না ধরা পড়লো আসামী, না পাওয়া গেলো চোরাই মাল। আস্তে আস্তে গৃহকর্তা আর পুলিশ দুদলই ছেড়ে দিল হাল। সবেমাত্র ঝিমিয়ে পড়েছে উত্তেজনা—নিঃশেষ হয়ে এসেছে গুজব, এমনি সময় আবার খোরাক জুটে গেলো শহরবাসীর। ডাকাতরা উত্তর প্রান্তের সজাগ দৃষ্টি আর পুলিশের তৎপরতায় উত্ত্যক্ত হয়ে হানা দিল দক্ষিণপ্রান্তে।

ই. সি-ব্লকের উচ্চপদস্থ কর্মচারীর বাড়ীর সুসজ্জিত বৈঠকখানাঘর—টেলিভিশনের পর্দায় নিবিষ্ট সন্ধ্যার আসর—হঠাৎ হানা দিল চারটি মূর্ত্তিমান—সঙ্গে রিভলবার, ভোজালি, হাতে বোমা, কয়েক মিনিটের মধ্যে দর্শকদের হৃৎকম্পন দ্রুততর করে গৃহস্বামীদের প্রায় নির্জীব করে, বেশকিছু সোনাদানা হাতড়ে—দে চম্পট! সেই চিরাচরিত প্রথার পুনরাবৃত্তি। প্রতিবেশীর চীৎকার, পুলিশের হুঙ্কার—আর ততক্ষণে সুপরিকল্পিত পলায়ন সাফল্যে ডাকাতরা হয়তো নির্বিকার।

আবার সবই হলো। সভা বসলো—সংবাদপত্রে খবর বের হলো, পুলিশ ভরসা দিল, প্রতিবেশী সজাগ হলো, কিন্তু কিছুই হলো না। না ধরা পড়লো ডাকাত, না পাওয়া গেলো চোরাই জিনিষপত্র। জল্পনা

কল্পনা চল্লো, এবার কোন প্রান্তে হানা দেবে ডাকাত—কোন গৃহস্বামীর ভাগ্য হবে বিড়ম্বিত।

সি. সি তে তৈরী হয়ে গেছে ডাক এবং তার বিভাগের কর্মচারীদের আবাসিক বাড়ীগুলি। সি, এ. ব্লকে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক পরিসমাপ্তির মুখে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। এই পার্কেই বিরাট মণ্ডপের মধ্যে প্রায় দশ হাজার লোকের বিপুল সমাবেশ হয়েছিল পশ্চিমবাংলার ১৯৭৮ সালের প্রলয়ংকরী বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলের দুর্গতদের সাহায্যার্থে।

ডি. সি ব্লকটি হবে কলকাতার ডালহাউসি স্কোয়ার অর্থাৎ বিনয় বাদল দীনেশ বাগের পূর্ণাঙ্গ প্রতিচ্ছবি। রাজ্য এবং কেন্দ্রের নামী অফিসগুলি অধিকাংশই স্থানান্তরিত হয়ে প্রতিষ্ঠিত হবে এই ব্লকে। বিবাদী বাগের পুনরাবর্ত্তন যে লবণহ্রদের কোন অংশে স্থান পেতে পারে, এটা ছিল কলকাতার স্বপ্নের বাইরে। তবে ইতিহাস আপনার খেয়াল খুশীতে ভাঙ্গাগড়ার আনন্দে মত্ত। এই খেয়ালখুশীর আমেজেই সুতানুটি হলো বড়বাজার, বনে জঙ্গলে ভরা শ্বাপদসঙ্কুল, চোর ডাকাতের লীলাভূমি, নরবলির প্রমত্ত হুঙ্কারের প্রতিধ্বনিত বনতল পরিণত হলো কলকাতা বিলাস ব্যসনের চরমতীর্থে। যেখানে পথিকের শ্বাস বন্ধ হয়ে আসতো ভীত সন্ত্রস্ত আতঙ্কিত হৃৎপিণ্ডের, সেইস্থানে আর তার সংলগ্ন গড়ের মাঠ হলো বর্ত্তমান কলকাতার ফুসফুস, যার সাহায্যে এখনও কলকাতা বেঁচে আছে।

ঠিক তেমনি করেই লবণহ্রদের বিশাল জলাভূমি, ইতিহাসের বিবর্তনবাদের চাপে পড়ে আর মানুষের সীমাহীন বুভুক্ষার তাগিদে রূপ নিল অজস্র ভেড়ির—ভেড়িতে নিরন্তর চাষ হলো কতরকমের মাছের—আর সেই মাছের দাপটেই লবণহ্রদের আশেপাশের সর্বত্র নাম মাছের—চিংড়িহাটা, বেলেঘাটা, তপসিয়া, ট্যাংরা।

তারপরে আবার দেখা দিল কালের আবর্তন—প্রায় শ্বাসরুদ্ধ কলকাতা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো অগণিত মানুষের নিরন্তর পায়ের চাপে। সর্বংসহা ধরিত্রীরও যেন সহ্যের সীমা শেষ হয়ে আসছে—নিশুতি

রাতের ধরিত্রীর বুকে কান পাতলে শোনা যায় শান্তিহীন ক্রন্দনধ্বনি। সেই কলকাতাকে বাঁচাতে জন্ম হলো শহর লবণহ্রদের। হাজার হাজার নিরাশ্রয় মধ্যবিত্ত আশ্রয় পেলো লবণহ্রদে—শহর কলকাতার প্রখ্যাত প্রতিষ্ঠানগুলি আর সরকারী দপ্তর সব শাখাবিস্তার করতে লাগলো একে একে লবণহ্রদে—বিবাদী বাগের উপছে পড়া প্রতিপত্তি আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ছে লবণহ্রদে—ভবিষ্যতের পরিকল্পনায় তাই আছে ডি. সি ব্লককে বিবাদী বাগের প্রতিচ্ছবি হিসাবে রূপায়িত করার।

ডি. ডি ব্লকে দেখা যাবে—আমোদ প্রমোদ ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলির সমাবেশ। মণিমেলা মহাকেন্দ্র শিশুদের অতি পুরাতন প্রতিষ্ঠান, তারই পাশে দেখা যাবে উদয়শঙ্করের সঙ্গীত ও নৃত্য শিক্ষা-কেন্দ্র—তারই কাছাকাছি দেখা যাবে উন্মুক্ত আকাশের নীচে মুক্ত অঙ্গন নাট্যশালা। তারই একপাশে যাত্রীদের আবাস আর একপাশে সরকারী অতিথিশালা—আরোও কত কি।

শহর লবণহ্রদ তড়তড়িয়ে বেড়ে চলেছে—কেতাদূরস্ত শহর জমজমাট হতে চলেছে—সম্পূর্ণাঙ্গ শহর লবণহ্রদ হবে কলকাতার প্রতিচ্ছবি। রূপকথার আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের স্পর্শে যেমন নিত্যনতুন শহর সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে—তেমনি শহর লবণহ্রদকেও কলকাতার এক নতুন রূপে দেখা যাবে।

সল্টলেকের তৃতীয় অধিবাসী—এ, ই ব্লকের মিসেস বি রায় জানালেন যে তাঁদের এই ব্লকের একপ্রান্তে পোল্লেদের যে শিবমন্দির ছিল, তার শিবঠাকুর ছিল তারকেশ্বরের বাবা তারকনাথের মতোই জাগ্রত—দূরদূর গ্রাম থেকে ভক্ত আসতো দণ্ডী কেটে—দিনের পর দিন পড়ে থাকতো হত্যা দিয়ে। বললেন—পোল্লের এক ছেলের ছিল পোলিও। শিবঠাকুরের প্রসাদী চরণামৃত যেমন দিত মাথায় ছিটিয়ে আর জিভের ওপর—তেমনি আবার ইঞ্জেকশনও চলতো রীতিমতো। পোল্লে গিন্নীর আপত্তি ছিল ঘোরতর—বলতো যে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় যেমন অ্যালোপাথি চলে না—তেমনি শিবঠাকুরের প্রসাদী

চরণামৃতের সঙ্গে ইঞ্জেকশন অচল। কিন্তু বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন পোল্লে চালাতো দুই চিকিৎসাই—দেবতার চরণামৃত আর ডাক্তারের ইঞ্জেকশান। পাগলাডাঙ্গার নিবারণ মাইতি জানালো যে শিবঠাকুরের মন্দিরে অনেক সাধুসন্ন্যাসীর আনাগোনা ছিল। কথা প্রসঙ্গে বললেন, একবার এক লামা এসে উপস্থিত তিব্বতের কোন মঠ থেকে। লামার ছিল তৃতীয় নেত্র। তবে ভগবান প্রদত্ত নয়—মানুষের সৃষ্টি, মানুষেরই নির্মিত যন্ত্রের সাহায্যে। লামা একদিন কৌতুহলী ভক্তদের ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন তৃতীয় নেত্রের বিশেষ তাৎপর্য্য। হিন্দু ব্রাহ্মণ হতে হলে যেমন উপনয়নেব প্রয়োজন—মুসলমান হতে হলে যেমন সুন্নত দরকার, ঠিক তেমনি কবে তিব্বতে লামা হতে হলে প্রয়োজন তৃতীয় নেত্রের।

দশবছর বয়সে ভবিষ্যৎ লামাদের মঠে নাম লেখাতে হয়। সেখানে বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যযন একজন অভিজ্ঞ লামাব কাছে সম্পূর্ণ ভাবে নিজেকে উৎসর্গ করে, তাঁরই নির্দেশ এবং অভিভাবকত্বে মঠের নিয়মকানুন ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের রীতিনীতিতে পারদর্শিতা লাভের জন্যে আবাসিক শিক্ষানবীশী করতে হয়।

তারপরে বুদ্ধপূর্ণিমার দিন শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তরুণ লামাকে দীক্ষিত করে তৃতীয় নেত্র কপালের ঠিক মাঝখানে, এক অভিনব যন্ত্রের সাহায্যে স্থাপিত করা হয়। একপ্রকার পাতার রস দিয়ে কপালের মাঝখানটি অবশ করে, সেখানে এক ধারালো যন্ত্রের সাহায্যে ফুটো করে রূপোর একটুকরো বসিয়ে দেওয়া হয় এবং সেটাই তৃতীয় নেত্রের কাজ করে। এই তৃতীয় নেত্রই হয় লামার দিব্যচক্ষু এরই মাধ্যমে সে ভূত ভবিষ্যৎ দর্শনের দাবী করে। পাগলাডাঙ্গার নিবারণ মাইতি কথার দম ফুরিয়ে আসছিলো, শেষবারের মতো হালকাসুরে বললো তৃতীয় নেত্র যখন মানুষের সৃষ্টি তখন আমরা তা একবার পেলে দিব্যচক্ষু দিয়ে ভেড়ির তলায় লুকানো মাছগুলির সাথে মোকাবিলা করা যেতো কি মজাই না হতো তাহলে।

শহর লবণহ্রদের সৃষ্টির আগে ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনস্ যখন দমদম 'হাওয়াই আড্ডায়' নামবার আগে আকাশে ঘুরপাক খেতো, তখন উপর থেকে শহরের কোনও চিহ্নই দেখা যেতো না। মনে হতো কোন এক অন্ধকার পুরীর দিকে এগিয়ে চলেছি। ওদিকে বোম্বে সান্তাক্রুজ হাওয়াই আড্ডায় নামবার সময় আরব সাগরের তীর ঘেঁষে আলোর ঝলমলের সে কি অপূর্ব দৃশ্য। সাগরের গা ঘেঁষা মেরিণ ড্রাইভকে তুলনা করা হয় ভারতমাতার কণ্ঠলগ্ন আলোয় গড়া এক অপূর্ব মণিহার। পরে শহর লবণহ্রদে যখন দেখা গেলো নিওন লাইটের আলোর ঝিলিক—তখন থেকে হাওয়াই জাহাজ থেকে পাওয়া যায় কলকাতার পরিচয়।

শহর লবণহ্রদের একটা বৈশিষ্ট্য হলো যে এর বৈদ্যুতিক শক্তি বহন করে যে ধাতুর সূত্রগুলি সেগুলি ধরিত্রীর বুক চিড়ে ছুটে চলেছে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে; মাথার ওপরে তারের জাল বিস্তার করে আকাশকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে না। শহর লবণহ্রদ এজন্য ও অনেক অভিজাত উপনিবেশগুলির হিংসার পাত্র। এমনকি আমাদের প্রতিবেশী লেকটাউন, উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের আবাসধন্য উপনিবেশ এ ব্যাপারে অনেক পিছিয়ে, যদিও তার প্রধান প্রবেশ পথ ও প্রধান প্রধান দু একটি রাস্তায় দামী এবং নামী আলোর ঝিলিক দেখা যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে এত সুন্দর যেখানে আলোর পরিকল্পনা, সেখানে অধিকাংশ দিন ব্লকের ভিতরে রাস্তাগুলো থাকে অন্ধকারে নিমগ্ন—মাথার ওপর বৈদ্যুতিক আলোগুলো শূন্যগর্ভ আর আমরা চলেছি কেরোসিন তেলের বর্ত্তিকা হাতে। আমাদের ব্লকগুলোর ছোট রাস্তাতে আলো জ্বলে না—কেন জ্বলে না সে এক তাজ্জব ব্যাপার। বড় রাস্তা গুলোতে নিয়ন লাইটের দামী আলো জ্বলে অথচ আমাদের বাড়ীর গলিগুলিতে কেন জ্বলে না—এ প্রশ্নের জবাব কেউ দিতে নারাজ। সবচেয়ে তাজ্জব হলো যে মেহনতী জনগণের প্রতিনিধি জনগণদরদী মার্কসবাদী সরকারের রাজত্বে আমাদের মতো গরীবদের প্রতি এই

অবিচার কেন? কাগজ কলমে আবেদন নিবেদন, নিয়মিত ডাকযোগে পাঠানো হয়—বড়কর্ত্তাদের কাছে হাজির হয়ে সমষ্টিগত দাবী জানানো হয়—শোভাযাত্রা করে কর্ত্তাদের কাছে দাবী পেশ করা হয় কিন্তু সবই ব্যর্থ। ক্রমাগত প্রচেষ্টার ফলে দেখা গেলো সমস্ত গলিগুলি আলোয় ঝলমল করে উঠলো—কিন্তু আমাদের সম্মিলিত সোচ্চাবের প্রতিধ্বনি আকাশে বিলীন হয়ে যাবার আগেই কোন এক অদৃশ্য হস্তের অকল্যাণ-স্পর্শে আবার রাস্তাগুলি ডুবে যায় অন্ধকারের অকুলতলে। এই অন্ধকারের মধ্যেই আমাদের চলতে হয় হোঁচট খেতে খেতে আর আলোর অধিকর্ত্তাদের কাছে আবেদনের মুসাবিদা করতে করতে। মাসখানেক ধর্ণা দেওয়ার পরে আবার একদিন জ্বলে ওঠে আলো দুচারদিনের মধ্যেই আবার ছায়াবিস্তার করার জন্যে। এই আলোছায়ার খেলা কতদিন চলবে? কেন এটা হয়? কারা দায়ী এই আলোকে ছিন্ন করে অন্ধকারকে টেনে আনার জন্যে?

কেউ আছে কি এ প্রশ্নের জবাব দেবার জন্যে? আমি লোড-শেডিংএর কথা বলছি না, আমি বলছি মুষ্টিমেয় কতিপয় লোকের কথা যাদের খেয়ালখুশিতে এটা ঘটে। বেশী কিছু বলা যাবে না। বিশেষ করে মা সত্যমপ্রিয়ম্—অপ্রিয় সত্যকথা বললেই আপনার কপালে ছাপ মেরে দেওয়া হবে যে আপনি কোন পার্টির দালাল, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাষণ গ্রাহ্য নয়। সাধারণ কর্মচারী যাঁরা আলোর খবরদারী করেন রাস্তায় রাস্তায় অর্থাৎ একমাস দেড়মাস অন্তর লাইটপোষ্টগুলিতে বাল্ব ঝুলিয়ে দেন—তাঁরা বলেন যে তাঁরা অসহায়। রদ্দিমার্কা যতসব ঠুনকো বাল্ব তাদের দেওয়া হয়—তারা সেগুলিই লাগিয়ে দিয়ে যায়—ফলতো দেখাই যায়। তাঁরা বড়কর্ত্তার কাছে অভিযোগ পেশ করতে বলেন - এই বড়কর্ত্তাটি কে এখনও তার সন্ধান পাইনি।

শহর লবণহ্রদের প্রতিটি ব্লকে ১টি করে পার্ক আছে, ব্লকটি বড় হলে ২টি পার্ক। পার্কের দরজায় নোটিশ মারা থাকতো "এখানে

খেলাধূলা করা নিষিদ্ধ," এছাড়া অলিখিত নির্দেশ ছিল "এখানে কোনরূপ পূজাঅর্চ্চনা করা চলিবে না।"

এখন প্রশ্ন ওঠে, আমাদের ছেলেমেয়েরা খেলাধূলা করবে কোথায় ? সরকারী কর্ত্তাব্যক্তি জানালো কেন ? ছেলেমেয়েদের জন্য তো সেন্ট্রাল পার্ক মহানুভব সরকার করে দিয়েছেন সেখানে পাঠাবেন। ৭।৮ বছরের ছেলেমেয়েদের পক্ষে ২।৩ মাইল দূরের সেন্ট্রাল পার্কে গিয়ে খেলাধূলা করা কিভাবে সম্ভব বোধগম্য হলো না। পার্কগুলো কিসের জন্য প্রশ্ন করায় জানানো হলো ওখানে হবে ফুলের বাগিচা—গোলাপের গুচ্ছ, হাস্নাহানার মিষ্টিগন্ধ, মাধবী লতার ঝাড়, চোখধাঁধানো রঙনা, বেলফুলের হিল্লোল আরও কত কি—সব মিলিয়ে পার্কগুলো সুন্দরের ছোঁয়া লেগে শহর লবণহ্রদকে সুন্দরতর করে তুলবে। আর আমাদের ছেলেমেয়েরা রাস্তার মোড়ে মোড়ে ইটের পাঁজা দিয়ে উইকেট বানিয়ে খেলবে ক্রিকেট আর বাড়ী তৈরী হয়নি এমন যে সব প্লট পড়ে আছে সেখানে খেলবে ফুটবল।

দুর্গাপূজা কোথায় হবে ? কেন রাস্তা তো রয়েছে—তাছাড়া রয়েছে ২৬´×২৬´ কিছু পার্কিং এর জায়গা, সেখানে তো করতে পারেন দুর্গাপূজা।

হায় মা দুর্গা, তোমায় নিয়ে এখন দাঁড়াই কোথা ? বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে আমরা তো প্রায় রাস্তায় দাঁড়িয়েছি, কিন্তু তোমাকে সেখানে দাঁড় করাতে লজ্জা করে—তোমাকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে কিভাবে প্রার্থনার স্তোত্র উচ্চারণ করতে পারি ?

"যশো দেহি, জিশো দেহি
ভাগ্যং ভগবত দেহি মে"

পার্কে দুর্গোৎসব নিষেধ, পার্কে ফুটবল খেলাও নিষেধ। পার্ক বার্দ্ধক্যের ভ্রমণ বিলাস, শৈশবের ক্রীড়াভূমি যৌবনের ফুলবাগিচা।

অষ্টম অধ্যায়

স্মৃতি রোমন্থন

লবণহ্রদের পুরাতন দিনগুলির খোঁজ খবরে বেরিয়ে পড়লাম। পঞ্চাশ বছর পার হয়ে গেছে। হঠাৎ খোঁজ পেলাম আমাদের সেই একটি উজ্জ্বল যৌবনের মালিক পণ্ডিত মহাশয়ের—শ্রী বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী। আদিনিবাস কোটালিপাড়া, যেখান থেকে আমাদের গ্রাম আঠার মাইল। এই দূরত্ব তিনি পায়ে হেঁটে মেরে দিতেন শনিবার বিকালে আর সোমবার সকালে আঠার মাইল রাস্তা অতিক্রম করে সোজা এসে ক্লাশে পড়াতে শুরু করতেন—না ছিল পথশ্রান্তি—না ছিল পথক্লান্তি। সেই পণ্ডিত মশায়ের সঙ্গে দেখা করলাম লবণহ্রদের অতীতের কথা শোনবার জন্যে। অশীতিপর বৃদ্ধ পণ্ডিত মশায় বর্ত্তমানে সাহিত্য পরিষদে বেদ অধ্যাপনায় ব্রতী। গতবার নিখিল ভারত বেদজ্ঞদের এক প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হতে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার পেয়েছেন। প্রায় বছর চল্লিশেক আগে বাগুইহাটির একপ্রান্তে—লবণহ্রদের সীমানার কাছে জায়গাজমি কিনলেন কাঠাপ্রতি ১৭ টাকা হিসাবে—বল্লেন যে এখন সে জমি পুরাণো মূল্যকে ৪০০ দিয়ে গুণ করলেও পাওয়া যাবে না। লবণহ্রদের কথা তুলে বললেন যে, সে লবণহ্রদ কি আর আছে? ভেড়ি এখনও অনেক আছে। ভেড়ি ভরাট করা শহর লবণহ্রদের আশেপাশে। কিন্তু তখনকার লবণহ্রদের চেহারাই ছিল আলাদা। এমন অনেক ভেড়ি ছিল যার বাঁধের ওপর দিয়ে পায়ে হেঁটে আসতে হৃৎকম্প হতো। বললেন বাঁধের একদিকে ছিল তলহীন পাঁক আর একদিকে গভীর জল। ডানদিকে পড়লে পঙ্কিল সমাধি আর বাঁদিকে পড়লে সলিল সমাধি।

লবণহ্রদের সেই পাঁকভরা জায়গা ছিল ডাকাতদের লীলাভূমি—

মানুষ খুন করে লাশ একবার টেনে এনে পাঁকের ওপর ফেলে দিলেই নিশ্চিন্ত—পুলিশের বাপ পিতামহের সাধ্য নেই যে সে লাশ কোনকালে খুঁজে বার করতে পারবে, আরও বললেন যে জ্যাংড়া পরগণার তেঘরিয়া, হাতিমারা এইসব গ্রামের আশেপাশেও এরকম পাঁকভূমি দেখা যেতো। গল্পচ্ছলে বললেন যে সুলঙ্গরীতে একবার বেঁধেছিল বিরাট এক দাঙ্গা। এটা লবণহ্রদেরই এক অংশ – যেখানে উদ্বাস্তুরা দলবেঁধে জবরদখল করতো। নীচু ধেনো জমি জবর দখলের হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে ভেড়ির জল ছেড়ে দিয়ে জমি জলে ভরাট করে দেওয়া হলো - কিন্তু উদ্বাস্তুরা মরিয়া হয়ে এসেছে জমি দখল করতে – বেঁধে গেলো মারমুখী দাঙ্গা—লবণহ্রদের ভেড়ির মালিকদের সঙ্গে শরণার্থীদের। চল্ল গোলা, চল্ল গুলি—মরলো বেশ কয়েকজন— লাশগুলো দেওয়া হলো গুম করে। নাছোড়বান্দা গৃহহারা শরণার্থীরা জবর দখল করে নিল। গ্রামের নামই হয়ে গেলো জবর দখল।

১৯৩০ সালের ১২ই মার্চ মহাত্মা গান্ধী লবণ আইন ভঙ্গ করার জন্য ডাণ্ডী যাত্রা করলেন। ৬ই এপ্রিল আরব সাগরের তীরে বোম্বের উপকণ্ঠে তিনি জীবন পণ করলেন। বিদেশী শাসকের প্রবর্ত্তিত এই আইনের বিরুদ্ধে মহাত্মাজী ঘোষণা করলেন, প্রকৃতির আশীর্বাদ জল ও বায়ুর মতোই বিশ্বের মানুষের জন্মগত অধিকার ও জীবনধারণের অপরিহার্য্য উপাদান লবণের ওপর কর ধার্য করবার অধিকার কোন শাসকের নেই। ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে সে এক স্মরণীয় দিন। গান্ধীজীর আহ্বানে ভারতের জনশক্তি জাগ্রত হয়ে দেখা দিল এক স্বাধীনতার সন্ধানে, ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে তাদের শোষণের বিরুদ্ধে। লবণ আইন ভঙ্গ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়লো ভারতের একপ্রান্ত হতে অপর প্রান্তে। লবণহ্রদও পিছিয়ে রইলো না—সমস্ত শক্তি দিয়ে লবণ-হ্রদের আশেপাশের জনগণ যোগ দিল এই আন্দোলনে গান্ধীজীর সুযোগ্য সেনাপতি শ্রী সতীশ দাশগুপ্তের অধিনায়কত্বে। এ কথা জানালেন, প্রাক্তন এম. এল এ শ্রী মাখন মণ্ডল তার বাঁগুইহাটির

বাড়ীর বৈঠকখানায় বসে। মণ্ডলমশায় ধূমায়িত এক কাপ চা পরিবেশন করলেন। সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশন করলেন অতীতের স্মৃতির গহ্বর থেকে আহরণ করে আনা টুকরো টুকরো ঘটনাগুলো।

তখন তাঁর বয়স ১০ কি ১১। লবণ আইন ভঙ্গ আন্দোসনে যোগ দিলেন ভারতের মুক্তি সংগ্রামের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে। সুন্দরবনের সংলগ্ন লবণহ্রদ. এই লবণহ্রদের অসংখ্য ভেড়ির মধ্যে একটি ভেড়ি হলো নারকেলতলা ভেড়ি—তারই একটু দূরে মহিষবাথান গ্রাম—এই গ্রামের উপকণ্ঠে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে খাটানো হলো তাঁবু আন্দোলন পরিচালক শ্রী সতীশ দাশগুপ্ত এবং অন্যান্য নেতৃস্থানীয়দের জন্য।

লবণহ্রদের লোণা মাটি দিয়ে ভরা হল বড় বড় মাটির জালা। তার নীচে ফুটো করে উপর থেকে ঢালা হতে লাগলো জল সেই জলের নোনামাটির রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করে লবণাক্ত প্রস্রবন স্থান পেলো বিশালকার কড়ার মধ্যে—চিতার মতো সাজানো হলো চুল্লি, তার ওপর কড়াই বসিয়ে জ্বাল দেওয়া হলো। বেরিয়ে এলো লবণহ্রদের যুগ যুগ সঞ্চিত নুন—বিতরণ করা হলো প্রকৃতি মায়ের আশীর্ব্বাদ গ্রামবাসীদের মধ্যে বিনামূল্যে। ভঙ্গ হলো বিদেশী শোষণের পাশবিক আইন। আন্দোলন ছড়িয়ে পড়লো ভারতের দিকে দিকে। ত্রিশকোটির মিলিত কণ্ঠে ধ্বনিত হলো গান্ধীজীর জয়। রুখে দাঁড়ালো নিপীড়িত, দলিত, শোষিত ভারতবাসী লবণ আইনের বিরুদ্ধে বৃটিশ রাজদণ্ডের বিরুদ্ধে; যেমন হুঙ্কার দিয়ে উঠেছিল অত্যাচারিত দরিদ্র ফরাসী জনগণ ফরাসী শাসকের লবণ করের বিরুদ্ধে—দেখা দিল ফরাসী বিদ্রোহ এবং বিরাট অগ্ন্যুতপাতের মতো পৃথিবীর সর্বত্র স্বৈরাচারের বুকে জাগালো হৃৎকম্প।

লবণহ্রদের মহিষ গোটের শ্রী খগেন মণ্ডল মহিষবাথানের লবণ আইন ভঙ্গের কাহিনীতে ফিরে এলেন—চোখ বুজে যেন অতীতের দিনগুলির সঙ্গে মোলাকাত করতে চেষ্টা করলেন—বল্লেন সে এক অপূর্ব দৃশ্য—চারিদিকে চিতার মতো বিরাট চুল্লি—তার ওপর বসানো হয়েছে বিশাল কড়াই—তাতে ভরা আছে লবণহ্রদের লবণাক্ত মাটি নিঃসৃত

লবণাম্বুরাশি। আশেপাশে ঘোরাফেরা করছে ব্যস্ত-সমস্ত স্বেচ্ছা-সেবকের দল ত্রিরঞ্জিত জাতীয় পতাকা হাতে।

মহিষবাথানে লবণ আইনভঙ্গ আন্দোলনে মেতে উঠেছে চারিদিকে স্বাধীনতা সংগ্রামে মত্ত জনগণ উদ্বেলিত উৎসাহে ঝাঁপিয়ে পড়েছে দেশ মাতৃকার শৃঙ্খল মোচনে। লবণ আইন ভঙ্গ আন্দোলন, ভারতের ইতিহাসের প্রথম পরিচ্ছেদ রক্তাক্ষরে লেখা -- নগর—গ্রাম-গঞ্জ-হাট সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লো মুক্তি যোদ্ধারা। হাতিয়ার অহিংস অসহযোগ আর মরণপণ--অধিনায়ক মহাত্মা গান্ধী। লবণহ্রদ পিছিয়ে নেই—মহিষবাথান পথপ্রদর্শক।

নেটিভদের দুঃসাহস ও ধৃষ্টতা অসহনীয় শোষক ইংরেজ শাসকের কাছে। বৃটিশ সিংহ গর্জে উঠলো—অত্যাচারের কশাঘাতে জর্জরিত হয়ে উঠলো অসহায় দেশবাসী—মহিষবাথানের পুলিশী অত্যাচারের কথা মনে পড়ে গেলো খগেনবাবুর—কড়াইগুলি দিল উল্টে, চুল্লিগুলো দিল ভেঙ্গে, স্বেচ্ছাসেবকদের করলো প্রহারে জর্জরিত, কারো বা গেল হাত, কারোও গেল ঠ্যাং—রক্তাপ্লুত দেহে তাদের পড়ে থাকতে হলো উন্মুক্ত আকাশের নীচে—যারা বন্দী হলো তাদের নিক্ষেপ করা হলো কারাগারে। চল্লো তাদের উপর অমানুষিক অত্যাচার। বন্দীদের ওপর অত্যাচারের প্রতিবাদে অনশনে মৃত্যুবরণ করলেন যতীন দাস—বিনয় বাদল-দীনেশের হাতের অব্যর্থগুলিতে প্রাণ দিল লোম্যান আর পঙ্গু হলো হাডসন। লবণহ্রদের মহিষবাথান অমর হয়ে থাকলো স্বাধীনতার ইতিহাসে—বল্লেন মহিষ গোটের শ্রী খগেন মণ্ডল। লবণ আইন ভঙ্গ আন্দোলন স্থান পেলো লবণহ্রদের ইতিহাসে। নারকেলতলা ভেড়ির মালিক লক্ষ্মীকান্ত প্রামাণিক তার সুযোগ্য অধিনায়ক সতীশ দাসগুপ্তের অনুপ্রেরণায় সর্বস্ব পণ করে যোগ দিলেন লবণ আইন-ভঙ্গ আন্দোলনে। চঞ্চলা চপলা নদী বিদ্যাধরীর চটুলতার কথা বলতে গিয়ে বল্লেন যে এ নদীর গতি ও রীতির বিশ্লেষণ করা মানুষের অসাধ্য। অসংখ্য শাখা-প্রশাখা বেরিয়ে এসেছে নদী থেকে। পরান চাপরাশীর

খাল, গেরিলা গুজর খাল, নীলকমল খাল মাত্র কয়েকটি এইসব শাখা-প্রশাখা চিত্রাবিচিত্র করে তুলেছিল লবণহ্রদকে—এদেরই আবেষ্টনীর মধ্যে বাঁধা পড়লো লবণহ্রদের অগণিত ভেড়ি সমুদ্রের উপছে পড়া লবণাম্বু রাশিতে।

নোনা জলের ভেড়ি—লবণাক্ত আস্বাদ নুনের আস্তরণ—জলের ওপর, আশেপাশের মাঠের ওপর, খাল কেটে বাঁধ দিয়ে মাছ আসতো ভেড়িতে। কাঠ দিয়ে জেলেজনরা তৈরি করলো স্লুইস গেট—মাছের স্রোত পথ পেলো জলকপাটের মধ্যে দিয়ে। সাগরের চিংড়ি আশ্রয় পেলো লবণহ্রদের ভেড়িতে।

অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে জোয়ারের জলে কানায় কানায় ভরে যেত ভেড়ি। ভেড়ি ভরে গেলেই খালের মুখ বন্ধ করে দেওয়া হতো বাঁধ পাটা দিয়ে। সঙ্গে নিয়ে আসতো অজস্র নোনা জলের মাছ চিংড়ি, ভাঙ্গর, আরও কত কী। ট্যাংড়া আসতো লাখে লাখে—চালান হতো ট্যাংরায়—সেখান থেকে ট্রাক বোঝাই করে নিয়ে যেতো কলকাতার বাজারে। চিংড়ি পাওয়া যেতো কতরকমের—চাম্‌নে চিংড়ি, হন্যে চিংড়ি, চাপড়া চিংড়ি, বাগ্দা চিংড়ি, গলদা চিংড়ি-সব চিংড়িই ভেড়ি থেকে ধরা পড়ে স্থান পেতো চিংড়িহাটায়। ঝুড়িতে ওজন হতো মাছের কাঁটায়—তৈরী হলো চিংড়িপট্টি, চিংড়ির চালান দিয়ে ফেপে ফুলে উঠলো—লক্ষ্মীঠাকরুণ বাঁধা পড়লো ভেড়ির মালিকদের ঘরে ঘরে।

সবদিন একরকম যায় না। জোয়ারের শেষে ভাটা আসে। যৌবনের অবসানে বার্দ্ধক্য দেখা যায়। ভেড়ির মালিকদের ভাগ্যেও দুর্দিন দেখা দিল।

কলকাতার আবর্জনা স্তূপ ফেলতে আবিষ্কার হলো লবণহ্রদ—কলকাতার ময়লা জল ফেলার জন্য খুঁজে পাওয়া গেলো বিদ্যাধরীর। কলকাতার ময়লা জলের স্রোত এসে দূষিত করে দিল বিদ্যাধরীকে। আবর্জনা স্তূপীকৃত হতে লাগলো বিদ্যাধরীর বুকে। একদা নৃত্যচঞ্চলা চপলা নদী, দিনে দিনে শীর্ণ হতে শীর্ণতর হতে লাগলো—কালস্রোতে

ভেসে গেলো তার অস্তিত্ব। বর্তমান বিদ্যাধরী বিগত যৌবনা—স্থবির পঙ্গু হয়ে পড়ে আছে লবণহ্রদের একপ্রান্তে, তার এই দুর্দশা দেখলেই কবির মনে প্রশ্ন জেগে ওঠে—এই কি তুমি সেই "যমুনা প্রবাহিনী।"

নদী বিদ্যাধরীর গতি হয়ে গেলো নিশ্চল, লবণহ্রদের ভেড়ির উৎস গেলো শুকিয়ে, নোনা জল আসা বন্ধ হলো—আসা বন্ধ হলো নদীর স্রোতের সঙ্গে নোনা জলেব মাছের চিংড়ি গেল ফুরিয়ে—চিংড়িহাটা গেলো শুকিয়ে—শুধু সাক্ষী থাকলো মাছের কাঁটা যাতে ওজন করা হতো হাজার হাজাব চিংড়ি মাছের ঝুড়ি।

ভেড়িব মালিকরা মাথা চুলকাতে লাগলো অতঃ কিম্। মাছ ধরা বন্ধ, পানা তোলা বন্ধ—পাগবা নিরর্থক—তাই সব বেকাব—জেলেজন, মেয়েজন, আর আলাজন।

এইসময় সরকার বাড়ীর বিধুভূষণ সরকার প্রথম পরীক্ষামূলক-ভাবে পোনা মাছের চাষ শুরু করলেন। ভেড়ির মালিকদের অনেকের মনেই সন্দেহ জেগেছিল যে নোনাজলে পোনা হবে কিনা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সরকাব মশায়ের পরীক্ষা ফলপ্রসূ হল—সকলেই তাকে অনুসরণ করে পোনা মাছেব চাষ শুরু করে দিল, লবণহ্রদে আবার দেখা দিল রমরমা, মালিকেব ঐশ্বর্য এল ফিবে—জেলে আবার জাল ধরলো, মেয়েরা আবার পানা তুললো, আলায় আবার পাগরা বসলো। কাজের সঙ্গে শুরু হলো গান আর গানের সঙ্গে শুরু হলো কাজ। আরো রকমারী মাছেব চাষ হলো—কাপিয়া সাইপ্রিণাম, গ্রাসকার্প। শেষোক্ত মাছটির প্রধান খাদ্য হলো ঘাস, সেইজন্য ওই নাম।

কথাপ্রসঙ্গে মণ্ডলমশায় জানালেন যে অতীতে ভেড়িকে কেন্দ্র করে এর আশেপাশের গ্রামগুলোতে বিশেষ করে খাসাবেড়ে, কলিপাড়া, বগ-ডোবা, হাটগাছা, ঠাকুরদাড়িতে একদল লোক ছিল যাদের জাতব্যবসা হলো মাছ চুরি—এদের উৎপাতে ভেড়ির মালিকদের সদাজাগ্রত থাকতে হতো। বর্তমান কালে সরকারের প্রচেষ্টায় এবং সমাজসেবীদের সক্রিয় সহযোগিতায় এদের সমাজের বিভিন্ন স্তরে কাজের মধ্যে নিয়োগ করা

হয়েছে এবং তারা স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন করছে।

পোনা মাছের সাথে দেখা দিল শোল, মাগুর, কই, ল্যাটাও অঢেল। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল তেলাপিয়ার চাষ। প্রজনন শক্তি এর অসাধারণ। দেখতে দেখতে ভেড়ি ভরে উঠলো তেলাপিয়ায়।

মণ্ডল মশাই বললেন বিদ্যাধরীর অফুরন্ত শাখাপ্রশাখা বিস্তারের ফাঁকে ফাঁকে দেখা দিত 'দ' আকৃতি বালুচর—সেখানে রোদ পোয়াত কুমীর। মাছ খেকো কুমীরের সাথে মানুষখেকো কুমীরও আসত।

আরও বললেন—শহর লবণহ্রদের ভেড়ির উন্নতির জনক স্বর্গীয় বিধান রায় একবার পোল্ডার স্কিম চালু করেন—লবণহ্রদের একটুকরো বালুজমি নিয়ে সেখানকার মাটির লবণাক্ত অংশ বের করে দেবার প্রচেষ্টায়। একদা চঞ্চল, তরঙ্গোচ্ছল নৃত্যরতা বিদ্যাধরী শহর কলকাতার পুতিদুর্গন্ধময় ময়লা জল অবাধ নিষ্কাশনের ফলে শুষ্ক শীর্ণ, ক্ষীর্ণকায়া উপেক্ষিত জলধারায় পরিণত হলো। বিদ্যাধরীকে তার বিগত যৌবনোচ্ছল দিনগুলি ফিরিয়ে দেবার প্রচেষ্টায় ঠাকুরদাঁড়ি গ্রামের পাশে পরাণ চাপরাশী খাল এই সঙ্গে ড্রেজিং করা হল। উদ্দেশ্য ওখান থেকে ড্রেজিং শুরু করে বিদ্যাধরীর গতিপথ পুনরুজ্জীবিত করে তোলা। কিন্তু আর্থিক অনটনে ধোঁয়াটে মাটির দৌরাত্ম্যে এই পরিকল্পনা সফল হল না।

তিনি আরো বললেন যে, 'আলা' বলতে ভেড়ি পাহারা দেবার জন্য জলের মধ্যে খুঁটি পুঁতে যে ঘর তৈরী করা হয় শুধু তাকেই বোঝায় না—ভেড়ির মালিকরা যেখানে বাস করতো তাকেও বলা হয়—শব্দটা এসেছে 'আলয়' হতে।

নবম অধ্যায়

নামের বাহার

লবণহ্রদের রাস্তা দিয়ে চলুন—ব্লকের ভিতর অলিগুলিই বলুন আর প্রশস্ত রাজপথ অথবা বুলেভার্ডই বলুন—যে পথ দিয়ে চলুন না কেন এদিক ওদিক তাকালেই দেখতে পাবেন নামকরণের কি বাহার—গৃহস্বামী অথবা গৃহকর্তাদের রুচিব পরিচয়।

নামের কত রকমারী আর কতই বা বাহার। শহর লবণহ্রদের গণ্ডীর মধ্যে পা দিতে না দিতেই আপনার চোখে পড়বে একখানা ছবির বাড়ী—নাম "স্বপ্নাতীত"—মাথা তুলে দাঁড়াবে, সেটা ছিল সত্যিই স্বপ্নাতীত। ডানদিকে আর একটু গেলেই দেখতে পাবেন সুন্দরতব একখানা বাড়ী নাম "অনন্যা"। তারপর রাস্তার দুদিকে তাকাতে তাকাতে চলুন দেখবেন নামের ডালি সাজানো রয়েছে। লবণহ্রদে শান্তির ছড়াছড়ি—শান্তিনীড়, শান্তি কুঞ্জ, শান্তি কুটির শান্তি আলয়, শান্তি নিলয়, শান্তি আবাস, এছাড়া আছে প্রশান্তি, আছে বিশ্বশান্তি—তবে শান্তি প্রাসাদ পেলাম না, বোধহয় প্রাসাদে শান্তির খুবই অভাব। আছে শেফালী, আছে সোনালী, আছে রূপালী আছে বর্ণালি, কিন্তু হেঁয়ালী পেলাম না। রয়েছে সুপর্ণা, রয়েছে অপর্ণা, রয়েছে সোমাপর্ণা—নেই অপূর্ণ, নেই কুপর্ণা। বঙ্কিমী যুগের নামেরও অভাব নেই, পাবেন শশীমুখী, পাবেন বিধুমুখী, পাবেন সূর্যমুখী, চন্দ্রমুখী। পাওয়া যাবে না হুঁকোমুখী অথবা গুরুমুখী। বাড়ীর নাম অঞ্জনা, পেয়েছি রঞ্জনা, পেলাম না খঞ্জনা, পেলাম না গঞ্জনা। পেয়েছি একতারা, পেয়েছি সেতার, পাইনি হারমোনিয়াম, পাইনি তবলা। এছাড়া ইন্দ্রাণী আছে, রাজেন্দ্রাণী আছে, নরেন্দ্রাণী দেখলাম না।

আরও দেখুন না—সুভাষ আছে, প্রভাস আছে, বিভাস আছে—তবে আভাস নেই। নামকরণের কত বাহার, আছে মর্মছায়া, আছে

রূপছায়া, ধূপছায়া খুঁজে পেলাম না। ইটালিয়ান কায়দার নাম চান—আছো 'হোমো ডি-ফ্লোরা' House of deer। ইংরাজীতে চান-আছে নর ওয়েষ্টার, Greenland, White-house আরও কত কি। আছে শিবালয়, ইন্দ্রালয়। তারপরে দোকানের নাম দেখুন। আমেরিকা থেকে আমদানী করে আনা হয়েছে মোনালিসা, বাংলাদেশের কক্সবাজারটি তুলে এনে এখানে কব্জি করা হয়েছে। তারপরে মহাপ্রভুর তো ছড়াছড়ি। আছে নিউ মহাপ্রভু, আছে জয়গুরু, আছে সাঁইবাবা, আছে নিত্যানন্দ, আছে ব্রজানন্দ। রামকৃষ্ণেরও তো ছড়াছড়ি। চয়ন করে এনে বসানো হয়েছে কমেট আর স্যাটেলাইট, হনুমানও বাদ পড়েনি, তবে জাম্বুবানের দেখা পেলাম না।

বসতি স্থাপন

শহর লবণহ্রদের বসতি বেড়ে চলেছে-হাট বাজারের তাগিদও শুরু হয়েছে। ১৯৭৪ সালে বি. ডি. মার্কেট টিমটিম করছে। ২।৪ জন দোকানদার দেখা যায় যৎসামান্য বেসাতি নিয়ে বসে, খুব আশা করে চড়া লাভের—কিন্তু বিক্রীই হয় না—তার লাভ কোথায় হবে, কিছুতেই আর জমতে চায় না—বাজারের ষ্টল বিক্রী হয়ে গেছে কিন্তু তাঁদের অধিকাংশই ভবিষ্যতের আশায় কোমর বাঁধছে। ১।১ জন আবার কোনরকমে আইন বাঁচিয়ে হাতবদল করছে। বি. ডি মার্কেট যখন টিমটিমায়মান সি. এ. মার্কেট তখন সদ্যবিকশিত রজনীগন্ধার মতোই ঝলমল করছে। কিন্তু বাইরের চাকচিক্যই সার ছিল ১৯৭৫, এ-ভিতরে সওদা করতে আসতো খুব কম লোক তবে দেখতে আসতো অনেকে। ভিতরে তারের জালি দিয়ে ঘেরা প্রাঙ্গনে রয়েছে হরেক রকমের পাখী, আপন খুশীতে উড়ে বেড়াচ্ছে জালে ঘেরা আকাশে আর মাটিতে। কংক্রীটের গর্তের মুখে দেখা যায় খরগোসের তুলতুলে বাচ্চাগুলো। পরিবেশটিকে দর্শনীয় করে তুলেছে নানাজাতীয় মরাল-মরালীর আনা-

গোনা শ্রোনিভারা দলসগমনা। ১৯৮১ সালে যে সব বিলাসিনী সন্ধ্যা-রাতের নিয়ন আলোয় ভরা রমরমা এই বাজারের মধ্যে টুকিটাকি কিনে বেড়ান—কসমেটিক্ কেনেন তারা ভাবতেই পারেন না ১৯৭৫ সালের সেই মিনমিনে বাজারের দৃশ্য। আস্তে আস্তে ভরে উঠলো বি. ডির বাজার, জমজমাট হয়ে দেখা দিল এই ব্লকের ও তার আশেপাশের বাসিন্দাদের প্রয়োজনের তাগিদে আপনা থেকে গড়ে ওঠা বাজার—এছাড়া এ. বি এসি ব্লকের বাজার, তার সঙ্গে গড়ে উঠেছে বি. সি ব্লকের দোকান ও দিকে লাবণী ও বিদ্যাসাগরের দৈনন্দিন চাহিদা মেটাতে গড়ে উঠেছে উপস্থিত মতো ছড়িয়ে বা ছিটকে পড়া বাজার—১৯৮১ তে বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া দেখা যায় না ময়লা থলি হাতে ছুটে যেতে বাগুইহাটি, মানিকতলা, মুচিবাজার বা লেকটাউনের দিকে। অবশ্য পালপার্বণে বা উৎসবে অথবা বিবাহে বা শ্রাদ্ধে প্রায় সকলকেই ছুটতে হতো দূরের পাল্লার হাটে বাজারে, সবসময়েই যেটা খুব লাভ-জনক বা খুব সুবিধাজনক তা নয়। দূরত্বের মোহ মানুষকে চিরকালই মুগ্ধ করে রেখেছে, এবং হাতছানি দিয়ে টেনে নিয়েছে। বাজারের বেলায়ও উহা সত্য।

শহর লবণহ্রদের গৃহনির্মাণে যৌথভাবে এগিয়ে আসে সবপ্রথম বিদ্যাসাগর গৃহনির্মাণ সমবায় সমিতি। লবণহ্রদ তখন সবেমাত্র ভরাট করা হয়েছে, বালির নীচের ভেড়ি এখনও একেবারে শুকিয়ে যায় নি, ২।১ জায়গায় তখনও ভেড়ির অস্তিত্ব স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে, শুকনো বালির ওপর এখানে ওখানে বৃত্তাকার জলের রেখা অথবা ছাপ—তখন যে সময় শহর লবণহ্রদের ভবিষ্যৎ অধিবাসীরা সন্দেহের দোলায় দোদুল্যমান, বিদ্যাসাগর গৃহনির্মাণ সমবায় সমিতি এগিয়ে এসেছিল গৃহনির্মাণের জন্য আর্থিক ঋণের ব্যবস্থা করে। ১৯৬৯ সালের লবণহ্রদ বহির্জগতে যার পরিচয় হচ্ছে বালুর মাঠ—সেই সময় ঐ বালুর মাঠে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল বিদ্যাসাগর গৃহনির্মাণ সমবায় সমিতির চারতলা বাড়ীর গুচ্ছ।

গৃহনির্মাণের জন্য আর্থিক ঋণের ব্যবস্থা করে বহু মধ্যবিত্ত গৃহস্থকে সাহায্য করেছে এই সমবায় সমিতি একটি আশ্রয়স্থল খুঁজে পেতে।

২ খানা শয়নঘর, ১টি বৈঠকখানা, একটি খাবার ঘর, এছাড়া ২টি ব্যালকনি, ২টি বাথরুম, ১টি রান্নাঘর সব নিয়ে দাম মাত্র ৩৫ হাজার টাকা। দরখাস্তের সঙ্গে দেয় ১০ হাজার গৃহপ্রবেশের সময় ১০ হাজার আর বাকী ১৫ হাজার ১৫ বছরের কিস্তিতে।

বিদ্যাসাগর গৃহনির্মাণ শেষ হয়েছে, দেখতে দেখতে নবাগত গৃহবাসীদের সমাগম হলো। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীন হাউসিং বোর্ড নতুন গৃহনির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন আনুষ্ঠানিকভাবে নামকরণ করা হলো লাবণি। সবশুদ্ধ ফ্ল্যাটের সংখ্যা ৭০০—বাসিন্দাদের সংখ্যা হলো প্রায় ৪০০০। এটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কলোনি, এর সেক্টরের মধ্যে দৈনন্দিন জীবনের যাবতীয় প্রয়োজনীয় কেন্দ্রগুলির ব্যবস্থা রয়েছে। আছে সমবায় সমিতি দ্বারা পরিচালিত র‍্যাশান এবং অন্যান্য দোকান, আছে ছোটদের শিক্ষাকেন্দ্র, আছে আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা—আছে খেলাধূলার জন্যে নির্দিষ্ট স্থান।

বিদ্যাসাগর জমজমাট—লাবণি লোকে এবং আলোকে ভরপুর—১নং সেক্টরে সমস্ত প্লট নিঃশেষ, ২নং সেক্টরের সব প্লট বিলি হয়ে গেছে—৩নং সেক্টরের প্রস্তুতি পর্ব প্রায় শেষ হয়ে গেছে। শ্যামলী ফ্ল্যাটের সব বিলিব্যবস্থা সমাপ্ত—শুরু ফাল্গুনীর ফ্ল্যাট। তাও নিঃশেষ।

হলো করুণাময়ী—করুণার ঝর্ণাধারা নেমে এলো মধ্যবিত্ত এবং নিম্নমধ্যবিত্ত আশ্রয়হীন পরিবারের মধ্যে। আস্তে আস্তে করুণাময়ীর ফ্ল্যাটও সব বিলি হয়ে গেলো—এ যেন অতল সৈকত বারিবিন্দুসম। যেই মুহূর্তে একটি করে কলোনি সৃষ্টি হয়, দেখতে না দেখতে জনগণের দাবী মেটাতে মুহূর্তে নিঃশেষ হয়ে যায়।

এখন বাকী আছে ৪নং এবং ৫নং সেক্টর। সেখানে রাস্তাঘাট সব তৈরী। কিছুদিনের মধ্যেই বিলি-ব্যবস্থার ব্যাপার নিয়ে শুরু হবে আলাপ আলোচনা—প্রশ্ন উঠবে, তারপর? তারপর আরোও ভেরি

ভরাট কর, আরোও বাড়ী তৈরী কর, আরও লোকের বাসের জন্যে জমি প্রস্তুত কর। তারপর এ প্রশ্নের কোনও সদুত্তর নেই। একদিকে ঘটা করে অনুষ্ঠানের আয়োজন করে চলেছে, বনোৎসব, পুকুর কেটে, পুকুর পরিষ্কার করে মাছের চাষ—আবার অন্যদিকে বন সাফ করে, জঙ্গল উপড়ে ফেলে—মাছের ভেড়ি ভরাট করে লোকের বাসস্থান রচনা করা—কোথায় এর শেষ, কে এর জবাব দেবে। গৃহহীন মানুষ সোচ্চার হয়ে উঠেছে, ঠাঁই চাই, ঠাঁই চাই—ধরিত্রী সর্বংসহা, সন্তানের অভাব মেটাতে সর্বদাই প্রস্তুত নিজেকে বিলিয়ে দিতে। কিন্তু ধরিত্রীও সীমাহীন নয়, ধরিত্রীর বুকে মানুষের পদচারণা কবে থেকে শুরু হয়েছে, সেইক্ষণ থেকেই অক্লান্ত, অশ্রান্তভাবে ছুটে চলেছে দিক হতে দিগন্তরে—প্রান্ত হতে প্রান্তান্তরে আশ্রয়ের সন্ধানে। একটুখানি বাসা বাঁধবার জন্যে সে বনে জঙ্গলে, পাহাড়ে পর্বতে, গাছের কোটরে, পর্বতের গুহায়, কোথাও বাদ রাখে নি। বাসা সে বাঁধলো যেখানে যেটুকু পেলো তার পরে গাছের ডালপালা সংগ্রহ করে বানালো সে ঝোপরি, বাঁশের খুঁটি দিয়ে একচালা, দোচালা, চৌচালা, আটচালা ঘর রচনা করলো। আশার শেষ নেই—চেষ্টার ত্রুটি নেই, নিত্য নতুন ঢং এর ঘর বানাতে লাগলো। গ্রামের রাঙামাটির পথ ছেড়ে সে চললো শহরের পীচের মসৃণ রাস্তার মোহে। কংক্রীটের আবিষ্কার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জমির অভাব মেটাতে মানুষের নজর পড়লো সীমাহীন আকাশের দিকে।

কলকাতাও ভরে উঠলো আকাশ ছোঁয়া হর্মরাজিতে—জনস্রোতের শেষ নেই। অগণিত তরঙ্গের মতো কলকাতার বুকে এসে হাজির হলো হাজার হাজার গৃহহারা মানুষ। স্থান দিতে হবে—কলকাতা এক অপূর্ব শহর, নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দেবার জন্যে সদা অবারিত এর সিংহ-দরজা। তাই আতিথ্যগর্বে গর্বিত কলকাতা নিরন্তর বসতি বিস্তারে সদা ব্যস্ত। গোবিন্দপুরের ঘনজঙ্গল কেটে সাফ করে বসতি স্থাপন করা হলো—সুতানুটির খানাখন্দ ভরাট হয়ে গেলো, গৃহনির্মাণ হলো, বর্গীর আতঙ্কে ভীতত্রস্ত কলকাতা পরিখা রচনা করলো শহরকে ঘিরে।

সেই পরিখাও শেষ পর্যন্ত ভরাট হলো মানুষের বসতি স্থাপনের জন্যে, নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দেবার জন্যে। এরপর মানুষের নজর পড়লো লবণহ্রদের জলাভূমির দিকে। একে একে ভেড়িগুলো দখল করা হলো। পূর্বের দিকে জ্যাংরা, দক্ষিণে সীমা হলো ট্যাংরা, উত্তরে কৃষ্ণপুর খাল আর পশ্চিমে বেলেঘাটা সবটাই দখল করে নেওয়া হলো, শহর লবণহ্রদের বিস্তারের জন্যে। বসতির জন্যে জমি চাই—সীমাহীন এর প্রয়োজন, অন্তহীন এর দিগন্ত। ধরিত্রীর শ্বাস রুদ্ধপ্রায়—মানুষের প্রচেষ্টা চলেছে নতুন নতুন স্থানের সন্ধানে প্রশান্ত মহাসাগরের তল-দেশে—লোহিত সাগরের বুকে আকাশের অসীমে। এছাড়া দুরন্ত দুর্দম বেগে ছুটে চলেছে স্পুটনিক তীব্র বেগে আকাশের বুক চিড়ে গ্রহ হতে গ্রহান্তরে, ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসছে বারেবারে—তবু প্রচেষ্টা রয়েছে অক্ষুন্ন।

দশম অধ্যায়

বিশ্বকর্মাদের ব্যস্ততা

লবণহ্রদ ভরাট হয়ে চলেছে নতুন নতুন পরিকল্পনার মাধ্যমে। প্রথমে ভরাট হলো সাড়ে তিন স্কোঃ মাইল—তারপরে আরো আড়াই স্কোঃ মাইল - মোট ছয় স্কোঃ মাইল ভরাট করে তৈরী হলো ৫টি সেক্টর, প্রতিটি সেক্টরে ১ লক্ষ লোকের বাসের ব্যবস্থা দ্রুতবর্ধমান জনসমষ্টির সঙ্গে পাল্লা দেবার চেষ্টা করছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার লবণহ্রদ শহরের পরিধি আরোও প্রসারিত করার জন্যে নতুন পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন। ২৫ কোটি টাকা ধার্য করা হয়েছে আরও ২ স্কোঃ মাইল পরিমিত জায়গা বর্তমান শহরের সঙ্গে যোগ করে দেবার জন্যে। ১৯৮১ সালের ৮ই জানুয়ারী শহর উন্নয়ন বিভাগের মন্ত্রী শ্রী প্রশান্ত সুর রাইটার্সে সাংবাদিকদের এক বৈঠকে জানালেন এই প্রচেষ্টার মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে কলকাতার বুকে যে নিরন্তর জনবৃদ্ধির চাপ পড়েছে তা যথাসাধ্য হ্রাস করবার জন্য। এই সংযোজিত ব্যপ্তির অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে কলকাতার অনগ্রসর শ্রেণী নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেদের বসতির জন্য। আরও জানালেন যে ভেরি ভরাট হবে গঙ্গার পলিমাটি দিয়ে—এবং যত শীঘ্র সম্ভব কাজ হাতে নেওয়া হবে।

স্বর্গীয় বিধান রায়েরও তো এই একই ইচ্ছা ছিল যে নবপরিকল্পিত শহর ভরে উঠবে নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বসতির দ্বারা। কিন্তু বর্তমানে কি দাঁড়িয়েছে? ১২০০ স্কোয়ার ফিটের একটি দ্বিতল বাড়ীব দাম ধার্য করা হয়েছে ৩নং সেক্টরে ২ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা। যে কোন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কাছে এই অঙ্কটি কল্পনা করাও দুরূহ, সংগ্রহ করা তো দূরের কথা। দেখা যাক, নব পরিকল্পনার ফল কি দাঁড়ায়।

মন্ত্রী মহোদয় শ্রী প্রশান্ত সুর ১৯৮১ সালের জানুয়ারী মাসের

এক বৈঠকে সাংবাদিকদের আরও জানালেন যে শহর লবণহ্রদে সি এম ডি-এ ৫০ একর জমি দখল করেছেন গরীবদের উপযুক্ত গৃহনির্মাণের জন্য। হাউসিং এবং আর্বান ডেভালপমেণ্ট করপোরেশন ২ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছেন এই পরিকল্পনাটি রূপায়ণ করার জন্যে।

সবার দৃষ্টি পড়েছে শহর লবণহ্রদের উন্নয়নের দিকে। যানবাহনের মন্ত্রী মহাশয় শ্রী মহম্মদ আমিন সাংবাদিকদের এক বৈঠকে জানালেন যে লবণহ্রদে ট্রাম লাইন চালু করা যায় কিনা সে সম্বন্ধে পরীক্ষানিরীক্ষা চলছে, যদি এই ব্যাপারে নিযুক্ত কমিটির রিপোর্ট গ্রহণযোগ্য হয়, তবে অদূর ভবিষ্যতে লবণহ্রদের বুকে চলবে ট্রামগাড়ী—আমরা আশা করে বসে রইলাম সেই সুদিনের অপেক্ষায়।

ডি. সি পাল ওরফে শ্রী দুলাল চন্দ্রের সঙ্গে দেখা হলো। বি. ডি মার্কেটের মুখোমুখি বিরাট বাড়িতে অফিসঘরে সদাব্যস্ত মানুষটি অমায়িক, হাসিখুশী। সল্টলেকের কেতাদুরস্ত পরিবেশটি গড়ে তুলতে যাদের অবদান আছে, তাঁদের মধ্যে একজন হলেন, শ্রী দুলাল চন্দ্র পাল ওরফে ডি. সি. পাল।

শিবপুরে ওর আদিবসতি ছিল, তবে শিবপুরের কোনও ডিগ্রি ছিল না। বিদ্যালয়েব নির্দিষ্ট স্থাপত্যবিদ্যার পুঁথিগত জ্ঞান আহরণ না করেও কেবলমাত্র নিজের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে প্রখ্যাত স্থপতি হওয়া যায়—তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন হলো শ্রী দুলাল পাল।

৩০।৩৫ বছর পার হয়ে গেছে—শিবপুরে প্রথম বাড়ী তৈরী করার হাতেখড়ি, দ্বিধাজড়িত পদে অতি সঙ্কোচের সঙ্গে পদক্ষেপ নিয়েছিলেন স্থাপত্যবিদ্যার জগতে। এই অজানা পথে চলার এক মাত্র পাথেয় ছিল বিরাট ইচ্ছাশক্তি আর অর্থোপার্জনের দুরন্ত তাগিদ। টাকার একটা নিজস্ব গতি আছে—সেই গতিপথে যে একবার জড়িয়ে পড়ে সে একরকম নিজের অজান্তেই টাকার ঘুর্ণিচাপে ঝড়ের বেগে এগিয়ে যায় ফিরে তাকাবার সময় পায় না। দুলাল পালও এগিয়ে চললেন দুর্দমনীয় বেগে অর্থোপার্জনের অদম্য উৎসাহে।

স্থাপত্য শিল্পের চললো পরীক্ষণ-নিরীক্ষণ—নতুন নতুন বাড়ী তৈরী করলেন আর চড়াদামে ছেড়ে দিতে লাগলেন। এই নেশার শুরু হয়েছিল শিবপুরে, তারপর এলেন বরাহনগরে—সেখান থেকে এলেন দমদমে, তারপব দড়িটানা নৌকায়—কৃষ্ণপুর খাল পার হয়ে প্রবেশ করলেন লবণহ্রদের বালুচরে।

১৯৬৮ সালে নভেম্বরে লবণহ্রদের জমি ও দলিল রেজেস্ট্রি করলেন আব ডিসেম্বরে ভিতপূজা করলেন। তখনও প্লটের সীমানির্দেশক পাথবের পিলাব বসানো হয় নি—বাঁশের খুঁটি দিয়ে সীমানা ঠিক করে বাড়ী শুরু করলেন। ১৯৬৮তে ভিতপূজাব দিন এসেছিলেন সল্টলেকের মুখ্য অধিকর্তা শ্রী ডি, পি চ্যাটার্জ্জি প্রসাদ নিলেন, উৎসাহ দিলেন, প্রেরণা যোগালেন, কিছু পরামর্শ দিয়ে চলে গেলেন।

ডি, পি, দাবী করলেন যে লবণহ্রদে প্রথম ভিতপূজা করেন তিনি, যদিও প্রথম গৃহপ্রবেশ করেন সর্বশ্রী জিতেন চক্রবর্ত্তী আর শরদিন্দু চ্যাটার্জ্জি।

তারপর ১৯৭২ সাল থেকে চালু হল পুরোদমে কাজ। দেখা দিল মরুভূমিব বুকে নিত্যনুতন ফুল—উঠলো ফুটে স্থাপত্যশিল্পের চরম উৎকর্ষ। দেখা দিল স্বপ্নাতীত, ফুটে উঠলো অনন্যা, তপ্তবালির বুকে গড়ে উঠলো বিশ্বশান্তি। পলিমাটির ক্যানভাসে রূপায়িত হলো আলেখ্য, ববিশাল থেকে পদ্মাপার হয়ে এল বাটাজোর। ওয়াশিংটনে আমেরিকার সভাপতির বাসভবন 'হোয়াইট হাউস' রূপান্তরিত হয়ে মাথা তুলে দাঁড়ালো বালুর মাঠে।

গাড়ী করে নিয়ে এলেন শ্রীপাল তাঁর ভিলা দেখাতে এ, সি ব্লকে। বাড়ীতো নয় যেন এক প্রাসাদ, পথচারীরা বাড়ীটির পরিচয় দেয়—কেউ বা 'TV' বলে আবার কেউ বা 'রেডিও বাড়ী' বলে।

পালভিলার সর্ব্বোচ্চ চত্বরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখা যায় একদিকে এয়ারপোর্ট হোটেল আর একদিকে হাওড়া পুলের আবছা ছায়া। আর যেদিকে চোখ ফেরানো যায় সেদিকেই দেখা যায় হর্ম্যরাজিমেলা—সর্বস্তরে

বিশ্বকর্মাদের ব্যস্ততা

মানুষের আশা আকাঙ্খার প্রতীক, 'ইষ্টক উপরি করি ইষ্টক স্থাপন', অমরত্ব এক উগ্র বাসনা।

পশ্চিমবঙ্গের রূপকার বিধান রায়ের যে কটি স্বপ্ন ছিল তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য লবণহ্রদ উপনগরী—যার বর্তমান নাম হচ্ছে বিধাননগর। এই স্বপ্নটিকে বাস্তবায়িত করে তুলতে যাঁরা এগিয়ে এসেছেন তাঁদের প্রথম সারিতে উল্লেখযোগ্য নাম হল লবণহ্রদের অন্যতম বাস্তুকার শ্রীজ্যোতিরঞ্জন রায়। লবণহ্রদের সমস্যা নিয়ে কর্তাব্যক্তিরা যখন মাথা ঘামাচ্ছেন বেলগ্রেডে—ফিরে এসে প্রেস কনফারেন্সে বিভিন্ন রকম বিবৃতি দিয়ে জল ঘোলা করেছেন, যাঁরা জমি কিনেছেন বা যাঁরা ভাবছেন জমি কিনবেন—তাঁরা সব যখন সংকটের ধোয়াশায় হাবুডুবু খাচ্ছেন তখনই দেখা দিলেন জ্যোতিরঞ্জন। সঙ্গে পেলেন মহম্মদ রফিক কে। লবণহ্রদের নির্মীয়মান শহরটিকে গড়ে তোলবার সাধনায় ব্রতী হলেন। কোম্পানীর নাম দিলেন 'সিকয়'। তখন লবণহ্রদের পরিচয় ছিল বালুর মাঠ—যেদিকে চোখ যায় শুধু বালি আর বালি। বি, ই, কলেজের অধ্যাপকদের স্নেহধন্য জ্যোতিরঞ্জন তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করে লেগে গেলেন বালুর মাঠের উপযোগী গৃহ নির্মাণে—নতুন ঢঙে, নতুন ছাঁদে।

শিবপুর বি, ই, কলেজ থেকে পাশ করে বেরোলেন জ্যোতিরঞ্জন ১৯৬৭ সালে। জ্যোতিরঞ্জনের অন্যান্য বন্ধুরা যখন বিদেশে যাবার প্রস্তুতিতে ব্যস্ত অথবা চাকরীর জন্য ছোটাছুটি করছেন তখন জ্যোতিরঞ্জন চাকরীর সুযোগ পেয়েও চাকরী নিলেন না—কারণ ব্যবসাই ছিল তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। এ ব্যাপারে মধ্যবিত্ত পরিবারের মানুষ তাঁর বাবা ছেলের সঙ্গে একমত হতে পারলেন না—ফলে জ্যোতিরঞ্জনকে বাড়ী ছাড়তে হল। তিনি উঠে এলেন ইলিসিয়াম বোর্ডিংএ—সম্বলমাত্র মেরিট স্কলারশিপের দু'শ টাকা। বোর্ডিংএ থাকতে মাসিক খরচ ৯০ টাকা। টাকা গেল ফুরিয়ে—কিন্তু জ্যোতিরঞ্জনের একগুঁয়েমী ফুরল না। বাসভাড়া মাত্র সম্বল করে একদিন বেরিয়ে পড়লেন ডালহাউসির পথে

—কোন একটা অফিসে ট্রেনিং নেবার সুযোগ খুঁজতে। তিনি যখন একরকম নিরস্ত্র অবস্থায় রাজভবনের সামনে দিয়ে হতাশ হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন তখন ঘটে গেল এক অপার্থিব ঘটনা। জ্যোতিরঞ্জনের সামনে দেখা দিল এক অপূর্ব মাতৃমূর্তি। পরনে লাল পাড় শাড়ি, সিঁথিতে লাল টুকটুকে সিঁদুর—হাত বাড়িয়ে দিল জ্যোতিরঞ্জনের দিকে সাহায্যের আশায়। এক দেবী সদৃশ ভিখারিণী—নিঃসম্বল আর এক প্রায় ভিখারীর কাছে। জ্যোতিরঞ্জন তার পকেট উল্টে দেখিয়ে দিলেন যে সে কত নিঃসম্বল। ঘটল অঘটন—ভিখারিণী রূপ নিলেন অন্নপূর্ণার—জ্যোতিরঞ্জনের শূন্য পকেট ভরে দিলেন নিজের ভিক্ষা ঝুলি শূন্য করে, জ্যোতিরঞ্জনের যাত্রা হল শুরু ঐশ্বর্য্যের গোলাপ বিছান পথে। 'সিকয়' এর মালিক জ্যোতি রায় কিন্তু আর কোনদিনও দেখা পেলেন পেলেন না সেই মাতৃমূর্তি এলোকেশীর—ভিখারিণীর।

'সিকয়' এর পত্তন হল ৬৮ সালে দাদা আশীষরঞ্জনের বাড়ীতে ৩৭ নং জ্যাকেরিয়া স্ট্রীটে—তার কিছুদিন পরেই চলে এলেন লবণহ্রদের বালুর মাঠে। সততা, নিষ্ঠা ও একাগ্রতাকে ভিত্তি করে এগিয়ে চললেন জ্যোতি-রঞ্জন লবণহ্রদের অগ্রগতিকে ধ্রুবতারা করে।

জ্যোতিরঞ্জনের প্রথম বাড়ী দেখা দিল আটষট্টির অক্টোবরে—মালিক বি, এন, চৌধুরী, ঠিকানা এ বি ১০৭। এখানেই আটষট্টির এপ্রিলে তিনিই সল্টলেকের সর্বপ্রথম বাস্তুকার যিনি অফিসের পত্তন করলেন এবং এখান থেকেই ১৯৭০ সালের ১৫ই আগষ্ট পর্য্যন্ত কাজকর্ম চালালেন। এ বাড়ীটি বানিয়ে যা লাভ করেছিলেন তার সবটাই দিলেন মহামায়ার পূজায় তাঁর শ্রদ্ধাঞ্জলি স্বরূপ। জ্যোতিরঞ্জন পূজো করলেন। নাটকের দল গড়লেন—দেখা হল তৃপ্তি চক্রবর্তির সঙ্গে—বাঁধা পড়লেন সাত পাকে। লবণহ্রদের প্রথম বাড়ীর মালিক জিতেন চক্রবর্তীর ভাইঝি তৃপ্তি চক্রবর্তীর সঙ্গে বিয়ে হল লবণহ্রদের দ্বিতীয় বাড়ীর নির্মাতা জ্যোতিরঞ্জনের।

'সিকয়' এর সাফল্যের কারণ তার সততা আর নিষ্ঠা—যখন লবণ-

হ্রদের জমির মালিক বাড়ী নির্মাণের খরচের চিন্তায় বিব্রত—তখন 'সিকয়' অনেক কম খরচে বাড়ী তৈরী করে সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের আশীর্বাদ কুড়িয়ে নিলেন অজস্র। যার ফলে চল্লিশের কোঠা পার না হতেই পশ্চিমবঙ্গের তরুণতম সেল্‌ফমেড মালটি মিলিওনার হলেন জ্যোতিরঞ্জন। বিরাট ঐশ্বর্য্যের মালিক জ্যোতিরঞ্জন—কিন্তু ঐশ্বর্য্য তাঁকে ডোবাতে পারেনি—১৯৬৮-র অমায়িক নিরহংকার মিতভাষী জ্যোতিরঞ্জন ১৯৮৪তে একটুও বদলায়নি।

একাদশ অধ্যায়

লবণহ্রদের দুর্গাপুজা

দুর্গাপূজা বাঙালীর একান্ত নিজস্ব। তার একান্ত আপন দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী মহিষাসুর মর্দিনী :

খণ্ডখণ্ডঞ্চ চক্রেন বৈষ্ণব্যা দানবাঃ কৃতাঃ
বজ্রেন চৈন্দ্রীহস্তাগ্রবিমুক্তেন তথাপরে ॥
কেচিদ্বিনে শুরস্সুরাঃ
কেচিন্নিষ্টা মহাহবাৎ।
ভক্ষিতা না পরে
কালী শিবদূতী মৃগাধিপেঃ ॥

'দানবদের কতকগুলি বৈষ্ণবীর চক্রদ্বারা ও অপর কতকগুলি ইন্দ্রের বজ্রের আঘাতে খণ্ড খণ্ড হইল। কতকগুলি অসুর মরিল, কতকগুলি যুদ্ধস্থান হইতে পলায়ন করিল। কতকগুলিকে কালী, শিবদূতী ও সিংহ খাইয়া ফেলিল।"

এখানে আমরা দুর্গাকে দেখি অসুরের বিরুদ্ধে প্রলয়ংকর যুদ্ধক্ষেত্রের নায়িকা—আবার আমরা তাকে দেখি বিশ্বের শান্তি প্রদায়িকা মাতৃস্বরূপিণী মঙ্গলময়ী শরণাগত দীনার্ত্ত পরিত্রাণ পরায়ণ সর্বস্যার্তিহরা :

"শরণাগত দীনার্ত পরিত্রাণ পরায়ণে
সর্বস্যার্তি হরে দেবী নারায়ণী নমস্তুতে"

মহিষাসুর মর্দিনীর রূপটি কিন্তু বাঙালীর একান্ত নিজস্ব নয়।

বাঙালীর দুর্গাপুজার বৈশিষ্ট্য যেমন একদিকে ফুটে উঠেছে তার প্রতিমা রূপায়ণে—মহিষাসুরমর্দিনী রূপের সঙ্গে চোখের সামনে ভেসে ওঠে বরাভয়-প্রদায়িনী কোমলকমনীয় স্নেহধারা বিগলিত মাতৃমূর্ত্তি, অন্যদিকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে।

ভোরের আলো ফুটে ওঠার আগেই ব্রাহ্মমুহূর্তে শুরু হয় চণ্ডীপাঠ

মায়ের চরণে অঞ্জলীর মন্ত্র প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে আকাশে বাতাসে, সন্ধ্যারতি ভরিয়ে তোলে ধূপধূনায়—মায়ের মুখখানি সুন্দরতর হয়ে ওঠে আলো আবছায়ার টানাপোড়েনে—নৃত্যরত ঢাকী ঢাকের বোল তুলছে, 'কাইনানা, কাইনানা, গিজদা গিজোর, গিজোর, গিজোর'—ভক্ত মাতৃ-বন্দনায় সম্পূর্ণ বিগলিত, পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণ, এসব মিলিয়ে এক অপার্থিব পুণ্য মুহূর্তের রচনা যেমন পূজোর একটা দিক, তেমনি অন্য দিকে হলো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের বিরাট আকর্ষণ।

শহরে অনুষ্ঠিত দুর্গাপূজার সমালোচক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আধিক্যের প্রতি সবসময়েই খড়্গহস্ত।

বাঙালীর দুর্গাপূজার ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে ষোড়শ শতাব্দীতে প্রথম দুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হয় তাহেরপুরে। পণ্ডিত রমেশ শাস্ত্রীর নির্দেশে তাহেরপুরের রাজা দুর্গোৎসব চালু করেন। খরচ হয়েছিল প্রায় আটলক্ষ টাকা। যদি তখনকার পূজোর কোন খাতায় কত খরচ হয়েছিল, তার একটি হিসেব পাওয়া যায় তবে দেখা যাবে যে পূজার ধর্মীয় উপকরণ যোগাতে যা খরচ হয়েছিল তার চেয়ে অনেক অনেক বেশী খরচ হয়েছিল জাঁকজমকের উপকরণ যোগাতে। সেই পূজোকে যখন শহরে টেনে আনা হলো তখন কলকাতা, রাতারাতি গড়ে ওঠা বড়-লোকদের খপ্পরে। পরে দুর্গোৎসব পরিণত হলো এক 'গ্র্যাণ্ড ফীষ্টে'। সাংস্কৃতিক উৎসবের নামে চলতো হিন্দুস্থানী বাইজীর নাচগান—মাঝে মাঝে যে গান আবার বিলাতি ঢঙে গাওয়া হতো ইংরেজ অতিথিদের খোসমেজাজে রাখবার জন্য।

উনবিংশ শতাব্দীতে কলকাতার যে সব জমিদার ইংরেজের নেকনজরে পড়ে তরতরিয়ে বেড়ে উঠেছিল, তারাই আবার বিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিতে ফাটল ধরার সঙ্গে বিলীন হয়ে গেল অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনীতির পরিবর্তনের চাপে পড়ে—যার ফলে দুর্গোৎসব আর জমিদারদের চার দেউড়ির মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ থাকলো না, বেরিয়ে এসে ধরা দিল বারোয়ারী বা বার-ইয়ার হাতে। দেবীর আভিজাত্য বেশ কিছুটা

ক্ষুণ্ণ হলো।—বার-ইয়ারীর মন রক্ষা করতে বার বার একশ চুয়াল্লিশ রকম পোষাকে সাজতে হলো দেবী দুর্গাকে। এইসময় ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়ে-শনের পূজাই সবচেয়ে বেশী জাঁকজমক অনুষ্ঠিত হতো—এদের পূজায় যোগ দিতেন তখনকার সল্টলেকের অধিকাংশ বাসিন্দা—এদের প্রধান আকর্ষণ ছিল লোকরঞ্জন শাখার সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠান পরিবেশন, বোধনের অনেক আগে চলতো অনুষ্ঠান। তারপর শহর লবণহ্রদের পূজার আসরে নেমে পড়লেন এ, ই, ব্লকের সমাজকল্যাণ সঙ্ঘ। এঁদের বিশেষত্ব হলো, শারদোৎসবের বেশীর ভাগ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হতো ব্লকের নিবাসীদের দ্বারা। রাতে কেউবা পরালো তাঁকে ঝিনুকের পোষাক, কেউ বা পরালো মসুরডালের আবার দুপুরের চড়া রোদে কোন কোন প্যাণ্ডেলে তাকে মুড়ে দেওয়া হলো অ্যালুমিনিয়ম বা তামার পাতে—কোথাও বা সারা অঙ্গে-পেরেক ঠুকে মাইকে ঘোষণা চললো "আসুন, দেখে যান, যন্ত্রযুগে তৈরী পেরেকের ঠাকুর।" দর্শকরা দেখে তো 'কেয়াবাৎ, কেয়াবাৎ' করছে, আর দশ প্রহরণধারিণী মা আমার সর্বাঙ্গে পেরেকের খোঁচা সহ্য করেও সহাস্য নয়নে ভক্তদের বরাভয় প্রদান করছেন—হয়তো পেরেক বিদ্ধ যিশুখ্রীষ্টের আবেদনে সাড়া দিয়ে বলছেন—"আগে সত্যিই তো এরা কিছুই জানে না, যে এরা কত অন্যায় করছে, তাই আমি এদের দোষ না ধরে আশীর্বাদ করছি।" আবার দেবী তিনি পেরেকেরই হোন বা পালকেরই হোন, ভক্ত ঠিক মন্ত্রোচ্চারণ করে প্রার্থনা জানাচ্ছেন—

দেহি সৌভাগ্যমারোগং
দেহি দেবী পরম সুখং
রূপং দেহি, জয়ং দেহি,
যশো দেহি, দ্বিষো জহি,

শহর লবণ হ্রদের প্যাণ্ডেলেও দেবী এলেন। প্রথম বারোয়ারী পূজার আয়োজন করলেন নাগরিক সমিতি এ বি, এসি ব্লকে।

তারপর প্রতি বৎসর সংখ্যা বাড়তে বাড়তে ১৯৭৪ সালে ১১ খানা

পূজোতে দাঁড়ালো—এর মধ্যে আছে বিদ্যাসাগর আবাসন আর আছে লাবনি।

১৯৮০ সালে শহর লবণহ্রদে দুর্গাপূজার সংখ্যা দাঁড়ালো প্রায় ৩০-এর কোঠায়, অবশ্য এর মধ্যে সবকটাই বারোয়ারী নয়—পুরানো কলকাতা ছেড়ে যারা এখানে এসে খুঁটি গেড়েছেন তাদের অনেকেই বাড়ীতে পূজা করেন।

লবণহ্রদে প্রথম অধিবাসী হলেন শ্রীজিতেন চক্রবর্ত্তী, প্রথম ভিতপূজা করলেন শ্রীদুলাল পাল, প্রথম ভাড়াটে হলেন একজন জার্মান ডাক্তার আর বাড়ীওয়ালা হলেন শ্রীশরদিন্দু চ্যাটার্জি। প্রথম দুর্গাপূজা করলেন শ্রী বি. রায় এ,ই, ব্লকে তার নিজের বসতবাটিতে। আর প্রথম বারোয়ারী দুর্গোৎসবের কৃতিত্ব হলো নাগরিক সমিতির শ্রীকালিদাস বোসের সভাপতিত্বে, ১৩৭৭ সালে, (ইং ১৯৭১ সালে) সদ্যোজাত শহর লবণহ্রদের মুষ্টিমেয় অত্যুৎসাহী কর্মীদের সহযোগিতায়। দশবছর আগে নাগরিক সমিতি মহামায়ার অর্চনায় যে মঙ্গলপ্রদীপটি জ্বালিয়ে ছিলেন তারই দীপশিখাটি ক্রমিক অগ্রগতির তালে তাল রেখে ক্রমবর্ধমান এই শহরের প্রতি ব্লকে ব্লকে আবাহন জানানো। নতুন শহরের নতুন অধিবাসীদের প্রতি পূজামণ্ডপে ভক্তজনের মিলিত কণ্ঠস্বরে উচ্চারিত হলো।

শরণাগত দীনার্ত পরিত্রাণপরায়ণে
সর্বস্যার্ত্তিহরে দেবী নারায়ণি নমোহস্তুতে॥

লবণহ্রদের দুর্গাপূজার ইতিহাসের দশবছর কেটে গেলো যেমন কেটে গেলো ৩৫০ বছরেরও বেশী কলকাতার দুর্গাপূজার ইতিহাসের। কলকাতার শহরতলী বরিষার সাধন চৌধুরীদের বাড়ীতে প্রথম ঢাকের বোল উঠেছিল মাহেশ্বরী নারায়ণী অর্চনায়—বেজে উঠেছিল 'কাইনানা কাইনানা...'। আবাল বৃদ্ধ বনিতার অন্তরে স্নিগ্ধ শরতের শিউলি ছড়ানো ভোরে আনন্দের শিহরণ জাগিয়ে।

তখনও কলকাতা জবচার্নকের খপ্পরে পড়েনি—তখনও কলকাতা

ইংরেজের ক্রীতদাস নয়। তখনও কলকাতায় বারভুঁইয়ার অন্যতম ভুইঁয়া যশোরেশ্বর প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত রায়রায়ান বসন্তরায়ের ঐশ্বর্য্যও আভিজাত্যসিঞ্জিত বরিষা—কিন্তু সে ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বর, সে আভিজাত্যের বর্ণচ্ছটা বেশীদিন টিকলে না। মাত্র ১৩০০ টাকার বদলে কলকাতার হস্তান্তর হলো—ইংরেজ বণিক দখল করলো কলকাতা—সৃষ্টি হলো নতুন ইতিহাস। কলকাতার দুর্গোৎসবে বিস্তার হলো বিদেশী প্রভাব, বিদেশী আদবকায়দা।

উনবিংশ শতাব্দীর কলকাতা তখন ইংরেজের ছত্রছায়ায়। মায়ের পূজো হলো উপলক্ষ্য, উৎসব হলো মুখ্য উদ্দেশ্য। উৎসব চলতো টাকার দাপটে আর বাইজীদের নূপুর নিক্কণে—চণ্ডীপাঠে চলতো শুম্ভনিশুম্ভের লড়াই, পূজার বেদীতে—আর উৎসবের মঞ্চে চলতো হাজার বাতির বালবের নীচে যাত্রার আসর আর গর্বের লড়াই, বিদ্যাসুন্দরের কামোদ্দীপ্ত-রসে ভরপুর হয়ে উঠতো হঠাৎ গজিয়ে ওঠা জমিদারের আটচালা মোসাহেবের উল্লাসে, টাকার ঝঙ্কারে আর রঙীন পানীয়ের প্রাচুর্যে চাপা পড়তো শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান আর পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণ।

ইংরেজের দয়াদাক্ষিণ্যে বুদ্ধির দৌলতে আর ভাগ্যের পাশাখেলায় টাকার স্রোত বয়ে যেতো অলিতে গলিতে, আনাচে কানাচে, বন্দরে বাজারে। কুড়িয়ে নিতে পারলো যারা, তারা অঢেল খরচা করতো—দোল দুর্গোৎসবে, রথযাত্রায় আর রাসপূর্ণিমায়। গাজনও এ ব্যাপারে সমানভাবে তাল ঠুকে চলতো।

কলকাতার দুর্গোৎসবের প্রতিষ্ঠাতা সাবর্ণ চৌধুরী, সুরু হয় বরিষার আটচালায়। রথের প্রতিষ্ঠাতা কারও মতে বসাকরা আবার কারও মতে শেঠেরা। দোলোৎসবও হয়তো শুরু হয়েছিলো সাবর্ণ চৌধুরীদের কুলদেবতা শ্যামরায়কে অবলম্বন করে, আর রাসের উৎসব শুরু করেন পিতাম্বর মিত্র। তবে রাসোৎসব সবচেয়ে বেশী মুখর হয়ে উঠতো বাগবাজারের গোকুল মিত্রের বাড়িতে।

আগেই বলা হয়েছে যে লবণহ্রদের প্রথম দুর্গাপুজা করেন এ, ই,

ব্লকের বাসিন্দা ডাঃ রায় তাঁর নিজের বাড়িতে—পূজার মণ্ডপে রবাহুত ছিল চতুর্থ আরক্ষা বাহিনীর পদাতিক দল আর প্রথম বারোয়ারী দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয় নাগরিক সমিতির পরিচালনায়। নাগরিক সমিতির সভাপতি শ্রীকালিদাস বোস।

১৩৭৭ সাল ইংরাজী ১৯৭ সাল—এই বছরেই লবণহ্রদের বারোয়ারী পূজার প্রথম পত্তন। এঁদের সপ্তমবর্ষের স্মরণিক একখণ্ড পেলাম। ১৩৮৩ (ইং ১৯৭৬) সালে মুদ্রিত। ১৩৮২ সালের আয় ব্যয়ের হিসাব থেকে পাওয়া যায়—এঁদের মোট খরচ হয়েছিল প্রায় ১০ হাজার টাকা।

চাঁদা আদায় ৫২৬৭ টাকা আর বিজ্ঞাপন বাবদ আদায় ৪৩৫০ টাকা, ঋণের পরিমাণ ১১০২ টাকা।

আয়

চাঁদা আদায়	৫২৬৭ টাকা
বিজ্ঞাপন বাবদ	৪৩৫০ টাকা
ঋণ	১১০২ টাকা
মোট	১০৭১৯ টাকা

ব্যয়

প্রতিমা ও শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানে প্রসাদ ভোগ ও প্রতিমার মঞ্চ	৪২২৯ টাকা
সাংস্কৃতিক মঞ্চ ও বিদ্যুৎ	৪১৪৪ টাকা
মুদ্রণ ও বিবিধ	১৮৮৩ টাকা
নগদ	৪৬৩ টাকা
মোট	১০৭১৯ টাকা

এই সালের স্মরণিকায় লবণহ্রদ পূজাকমিটির সভাপতি সাংবাদিক শ্রীনিরঞ্জন সেনগুপ্ত তাঁর নিবেদনে জানালেন যে শহর লবণহ্রদের পত্তনের প্রস্তাবে ভেড়ির মালিকরা প্রতিবাদ করেছিলেন, তাদের অভিমত যে

ভেড়ি বুজিয়ে লবণহ্রদ শহর তৈরী করলে কলকাতায় মাছে আকাল হবে এবং কলকাতায় ময়লা জল নিষ্কাশনের পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে এবং তার ফলে কলকাতায় দেখা দিতে পারে মহামারী। সাংবাদিক নিরঞ্জন সেন লিখলেন যে ভেড়ির মালিকদের আতিথ্যে মুচমুচে মুড়ির সঙ্গে মুচমুচে মাছভাজা খেতে খেতে সায় দিয়েছিলেন ভেড়ির মালিকদের কথায়। তিনি তখনও ভাবতে পারেন নি যে একদিন এই মুচমুচে লবণহ্রদ শহরে একটি মুচমুচে বাড়িতে বসবাস করবেন। তিনি সভাপতির নিবেদনে ১৯৭৬ সালে এই প্রশ্ন তুলেছেন যে তখনও এ শহরে হাইস্কুল নেই, হাসপাতাল নেই, দোকান বাজার যথেষ্ট নেই, যখন তখন বিদ্যুৎ বিভ্রাট হয়, রাস্তায় আলো জ্বলে না, মশামাছি পোকামাকড়ের উপদ্রবে জীবন অতিষ্ঠ। লবণহ্রদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সরকারী ঘোষণাগুলিকে পরিহাস করে শূন্য আছে বহু প্লট হোল্ডারের জমি।

লবণহ্রদ শুধু একটা অতীত নয়, ভবিষ্যতের একটা প্রতিশ্রুতিও বটে। সেই প্রতিশ্রুতি একদিন পূরণ হবেই। প্রশ্ন হলো কবে? আমাদের সন্তানদের আমলে? অথবা আরও পরে?

সম্পাদকীয় মন্তব্যে শ্রীব্যোমকেশ সিংহ লিখলেন যেন চোখের পলক, মুহূর্তের অন্তরাল। বন কেটে বসত নয়, হ্রদ বুজিয়ে ডাঙ্গা এবং তারপর যেন নিমেষে আবার ভোজবাজী। যে ডাঙ্গায় ধূ ধূ করতো বালি, সেখানে সবুজ ঘাসের ভীড়, কাশফুলের জটলা, নানান মানুষের কল কোলাহল। দেখতে দেখতে জনপদ গড়ে ওঠে। মানুষের আকাঙ্খা এক একটা আবাসে রূপ নেয়। নতুন কলকাতা বিধাননগরে আসে কর্মচাঞ্চল্য, প্রাণের জোয়ার। ভক্তরা দুর্গতিনাশিনী মায়ের আরাধনার উদ্যোগ করে।

এবি ব্লকের আবাসিক সঙ্ঘ শারদোৎসব শুরু করেন ১৩৮৬ সালে (ইং ১৯৮০)।

সভাপতি শ্রীকালিদাস বসু এবং সম্পাদক শ্রীতীর্থঙ্কর ঘোষ। ১৩৮৬ সালের আয়-ব্যয়ের হিসাবে দেখা যায়।

চাঁদা আদায়	৪৫৫০ টাকা
বিজ্ঞাপন বাবদ	৭৫৬৬ টাকা
মোট	১২১১৬ টাকা
পূজাবাবদ খরচ	৬৩৩৪ টাকা
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বাবদ খরচ	৩৩১৭ টাকা
মুদ্রণ	১৩০০ টাকা
মোট	১০৯৫৮ টাকা

এসি ব্লক—এসি ব্লক দুর্গোৎসব সমিতির পরিচালনায় বেশ জাঁকজমকের সঙ্গে মায়ের পূজার আয়োজন করেন।

সমিতির সভাপতি শ্রীসুকুমার চক্রবর্ত্তী, সম্পাদক শ্রীবিজয়কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

চাঁদার পরিমাণ	৫৮৭৯ টাকা
বিজ্ঞাপন বাবদ	৪৬২৫ টাকা
মোট	১০৫০৪ টাকা
পূজার শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান, ভোগ বেদী	৫৫৮৮ টাকা
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান	৩৬৯২ টাকা
মুদ্রণ	৭২৫ টাকা
মোট	১০০০৫ টাকা

এডি ব্লকঃ ১৩৮৭ (ইং ১৯৮০) সাল এডি ব্লকের দুর্গোৎসবের দ্বিতীয় বর্ষ। ব্লকের রিক্রিয়েশন ক্লাবের পরিচালনায় দুর্গোৎসবের আয়োজন করা হয়।

১৩৮৬ সালের আয় ব্যয়ের হিসাব

চাঁদা আদায়	৪০৭৪ টাকা
বিজ্ঞাপন বাবদ	৫৩৫০ টাকা
মোট	৯৪২৪ টাকা

পূজার শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান, বেদী, ভোগ, আলো ইত্যাদি	৫৭৫৬ টাকা
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান	১৬৮৮ টাকা
মুদ্রণ	৮৫০ টাকা
মোট	৮২৯৪ টাকা

এ, ই ব্লক দুর্গোৎসব বিধাননগর সমাজ কল্যাণসঙ্ঘের পরিচালনায়। এই ব্লকের দুর্গোৎসব শুরু হয়েছে ১৩৮৪ ইং ১৯৭৭) সালে।

তখন মূল সভাপতি ছিলেন ডঃ রণজিৎ কুমার দে। সাধারণ সম্পাদক শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য্য। পূজা কমিটির চেয়ারম্যান হলেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীবিমল কর এবং সম্পাদক শ্রীসুশীল রায় চৌধুরী।

১৯৭৮ সালে পশ্চিমবঙ্গের বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলবাসীদের সাহায্য কল্পে লবণহ্রদের অধিকাংশ দুর্গোপূজা সমিতি পূজায় আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বন্ধ করে দিয়ে উদ্বৃত্ত অর্থ ত্রাণ তহবিলে দান করেছিলেন। এ, ই ব্লক সমাজ কল্যাণ সংঙ্ঘও সমস্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সূচী নাকচ করে মুখ্যমন্ত্রী তহবিলে দান করলেন। এছাড়া সমাজকল্যাণ সঙ্ঘের সভ্যরা বন্যাদুর্গতদের জন্য খাদ্যসামগ্রী অর্পণ করলেন বাগুইহাটির বন্যাত্রাণ শিবিরের কর্মকর্তাদের হস্তে। সেবার পূজাসমিতির সভাপতি ডঃ রঞ্জিত কুমার দে আর সম্পাদক ছিলেন শ্রীসুশীল রায়চৌধুরী।

তারপর ১৯৭৯ ও ১৯৮০ সালে দুর্গাপূজা সমিতির চেয়ারম্যান হলেন প্রাক্তন সম্পাদক শ্রীসুশীল রায়চৌধুরী আর সম্পাদক হলেন সঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমানসরঞ্জন মুখার্জী।

শুরু থেকেই দুর্গোৎসব সমিতির কর্মপন্থা গ্রহণ করা হলো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হবে একমাত্র এ, ই ব্লকের শিল্পীদের নিয়ে।

তাই শারোদৎসবে অধিকাংশ অভিনয় পরিবেশন করা হলো প্রখ্যাত

নাট্যবিশারদ ডঃ অজিত কুমার ঘোষের প্রযোজনায় ও ব্যবস্থাপনায়। শিল্পীদের সকলেই এই ব্লকের বাসিন্দা।

এই ব্লকের শারোদৎসবের একটি বৈশিষ্ট্য মহিলা সমিতি আয়োজিত এবং অভিনীত ও মঞ্চস্থ নাটকগুলির অভিনয়। প্রথম বর্ষে অভিনীত হলো রবীন্দ্রনাথের 'চিরকুমার সভা', এর পরিচালনা এবং প্রযোজনার মাধ্যমে প্রকাশ পেলো ডঃ অজিত কুমার ঘোষের অপূর্ব শিক্ষণ নৈপুণ্য। ১৯৭৮ থেকে মহিলা অভিনীত নাটক পরিচালনার ভার ন্যস্ত হলো বন্ধুবর সন্দীপ বাবুব ওপর। তাঁর পরিশীলিত অভিনয় পরিচালনা, সুসংবদ্ধ ব্যবস্থাপনা সর্বোপরি অভিনব শিক্ষণ পদ্ধতি। নতুন সাড়া পড়ে গেল মহিলা কুশীলবদের মধ্যে। মঞ্চস্থ হলো মানময়ী গার্লস স্কুল ১৯৭৯ সালে—আর ১৯৮০ সালে হলো 'এ বাড়ী ও বাড়ী।'

১৯৭৯ সালের আয়ব্যয়ের হিসাব থেকে পাওয়া যায়—

চাঁদা আদায়—	৭৬৩৪ টাকা
বিজ্ঞাপন বাবদ—	৬১৪০ টাকা
মোট	১৩৭৭৪ টাকা

পূজার শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান, বেদী, আলো, ভোগ ইত্যাদি	৭৩২২ টাকা
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, মঞ্চ, আলো ইত্যাদি	৪৬৫৭ টাকা
মুদ্রণ	১৬৫৭ টাকা
মোট	১৩৬৩৬ টাকা

১৮৮০ সালে মূল সমিতির সভাপতি ডাঃ জগৎবন্ধু মুখোপাধ্যায় বললেন 'দেবী মহামায়ার ব্রত উদ্‌যাপন শেষ হলো অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে। উৎসবকে কেন্দ্র করে কয়েকদিন ধরে যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পংক্তিভোজনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল তা এক কথায় অনবদ্য। প্রতিদিন পূজামণ্ডপে দেবীর আরতি, অঞ্জলি ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যে ব্যাপক জনসমাগম ঘটেছিল, তা প্রমাণ করে দিল, আমাদের পারস্পরিক

সম্পর্কের ভিত্তি কত মজবুত, সাংগঠনিক ব্যবস্থা কত জোরালো। 'দোষ ত্রুটি ভুল ভ্রান্তি শুধরে নিয়ে আসুন আমাদের সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আমরা সঙ্ঘকে আরও বড় করে তুলি।'

সম্পাদকের কলম থেকে বের হলো পুরানো জীবনের ইতিহাসকে রেখে আমরা এখানে যে আগামী দিনের নতুন সমাজ গড়ার সঙ্কল্প নিয়ে এসেছি, যে সংকল্পের বাস্তব রূপায়ণে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন সামাজিক উৎসব। এর জন্য যে ঐক্যবদ্ধ সমাজ জীবনের সাংগঠনিক শক্তি দরকার তা আমাদের আছে।

বি. সি রেসিডেন্টস এ্যাসোসিয়েশনের মূল সভাপতি শ্রীনিরঞ্জন সেনগুপ্ত ও সম্পাদক শ্রীআর এন সাহা। পূজা কমিটির সভাপতি ডাঃ ষষ্ঠী চৌধুরী এবং সম্পাদক শ্রীসত্যরঞ্জন কর।

বি. সি. ব্লকের পল্লীবাসীরা আমাদের কথায় লিখলেন ঃ—"আমাদের নামডাক নেই। অথবা বলা যায় আমাদের ডাকনাম নেই, না আমরা যে উপশহরে বাস করি তার, না আমরা যে পল্লীর বাসিন্দা তার। আমাদের এই জনপদের সরকারী নাম সল্টলেক সিটি আর আমরা যে পল্লীতে বাস করি তার তার নাম বি. সি. ব্লক। ডেকে মন ভরাবার মত নয় কোনটাই। এমন নামের মধ্যে নগর পরিকল্পনাকারদের জ্যামিতি যদি বা থাকে, কাব্য নেই, ভূগোল যদি বা থাকে, ইতিহাস নেই, ইতিহাস নেই তার কারণ এই জনপদ নিতান্ত অর্বাচীন। কোনও বৈঠকখানা বা কালিঘাট বা আলিপুরের স্মৃতিমাখা ইতিহাস এর সঙ্গে জড়ানো নেই। সদ্যোজাত শিশুর পরিচয় যেমন হাসপাতালে বেড টিকিটের নম্বর দিয়ে আমাদের এই অধুনা ভূমিষ্ঠ জনপদের সাদামাটা পরিচয়ও তেমনি বর্ণহীন ইংরেজী বর্ণের অনুক্রম দিয়ে।

এদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু হলো রামায়ণ গান দিয়ে আর শেষ হলো শ্যামাকান্ত দাসের আলিবাবা পাঁচালি দিয়ে।

সপ্তমীতে হলো আবৃত্তি প্রতিযোগিতা, আনন্দমেলা আর শ্রীমতি কুমকুম মিত্রের পরিচালনায় ঋতুরঙ্গ। অষ্টমীতে বৈকুণ্ঠের খাতা নাটক

আর নবমীতে চিত্রানুষ্ঠান।

বি. ডি ব্লক ঃ—বি. ডি ব্লক দুর্গোৎসব কমিটির সভাপতি শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ চ্যাটার্জী এবং সাধারণ সম্পাদক শ্রীহরিদাস চক্রবর্তী এরাই আবার মূল সমিতির সভাপতি ও সম্পাদক।

এদের পূজার প্রথম বর্ষ হলো ১৯৭৯। এই ব্লকে দুর্গোৎসবের পত্তন করতে গিয়ে কারণ দেখিয়ে বললেন ঃ 'সল্টলেকের মধ্যে সবচেয়ে জনবহুল ব্লক হলো আমাদের বি, ডি। অথচ গতবছর আমাদের মা বোনেরা অঞ্জলি দেবার জন্য হাতের কাছে কোন প্রতিমা পাননি। যখন জানতে পারলাম এবার প্রতিটি ব্লকেই পূজো হচ্ছে কেবল বি, ডি. ব্লক বাদে তখন পাড়ার উদ্যোক্তাদের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করা নৈতিক কর্তব্য বলে মনে করছি।'

সাধারণ সম্পাদক তাঁর কথায় বল্লেন "বিচ্ছিন্নতাবাদীদের অসুর আমাদের টুটি টিপে ধরেছে। সল্টলেকের মধ্যে সবচেয়ে বেশী জন অধ্যুষিত বি. ডি. ব্লক। অথচ আমাদের কোনও নিজস্ব প্রতিষ্ঠান নেই। আমরা একে অপরকে চিনি না। আমাদের পথে পথে আলো জ্বলে না, কলে জল ওঠে না, আগাছায় সারা ব্লক জঙ্গল হয়ে উঠেছে। আমাদের ছেলেমেয়েদের খেলাধুলার কোন ব্যবস্থা নেই, আমাদের কোনও লাইব্রেরী নেই, ব্যায়ামাগার নেই, এমন কি নিজেদের একটা পার্ক পর্যন্ত নেই।

এঁদের ১৯৭৯ সালের দুর্গোৎসবের আয় ব্যয়ের হিসাব—

চাঁদা আদায়—	১৯৮৬ টাকা
	৩৮২৩ টাকা
বিজ্ঞাপন বাবদ—	৭৪৭৬ টাকা
পূজার শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান, বেদী প্রতিমা ইত্যাদি—	৭০৯৩ টাকা
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বাবদ	৩৬২৮ টাকা
স্যুভেনীর—	১৫৮৫ টাকা

লবণ হ্রদের ইতিকথা

সল্টলেক ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭৩ সালে। শহর লবণহ্রদের কেন্দ্রবিন্দু বি. ডি. ব্লকে এদের প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে।

যদিও নাগরিক সমিতি বারোয়ারী পূজার প্রথম পত্তন করেন ১৯৭০ সালে সল্টলেক ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন জাঁকজমকের সঙ্গে দুর্গোৎসবের আয়োজন করেন ১৯৭৪ সালে।

এই সময়কার লবণহ্রদ শহরের একটা নৈরাশ্যজনক ছবি আঁকলেন অ্যাসোসিয়েশনের সভ্যবৃন্দ "আমাদের কথায়" ১৯৭৪ সালের স্মরণিকাতে "—দুঃখের বিষয় এই সুপরিকল্পিত নির্মীয়মান নগরের নাগরিক হয়েও আমরা আজ পর্যন্ত সভ্য নাগরিক জীবনের অধিকাংশ সুযোগ সুবিধা থেকে নির্মমভাবে বঞ্চিত—নগরের বৃহত্তর অংশ জুড়ে যানবাহনের ব্যবস্থা নেই, বাজার নেই, রেশনের দোকান নেই, দুধের ডিপো নাই, বিদ্যালয় নেই, পরন্তু আমাদের ঘাড়ে চাপানো হয়েছে সমগ্র কলকাতা শহরের আবর্জনা স্তূপ, তার পুতিগন্ধে এখানকার আকাশবাতাস ভারী হয়ে উঠেছে। মশায় মাছিতে আমরা বিব্রত ও ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছি।"

বিধাননগর সার্বজনীন দুর্গোৎসব সমিতির সম্পাদক শ্রীঅজিত হালদার 'সম্পাদকের কলমে' লিখলেন—

"সল্টলেক ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে ও পরিচালনায় বিধাননগর সার্বজনীন দুর্গোৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। জাতীয় জীবনে যখন দুর্যোগের ঘনছায়া, বন্যা, খরা ও খাদ্য সঙ্কটে যখন সমগ্র দেশ দিশেহারা, তখন এই পূজানুষ্ঠানের ঔচিত্য সম্বন্ধে অনেকের মনে সংশয় জাগতে পারে। কথাটুকু মনে রাখতে পারি তবে দেবীর আরাধনা সার্থক হয়ে উঠবে। দুর্গোৎসবের শুভ মুহূর্তে আমরা সবাইকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই।

শ্রীসঞ্জীব সিনহা "অথ সঞ্জীব উবাচ" শীর্ষক কবিতাটিতে লিখলেন :

এক যে আছে লবণহ্রদ সবরকমে ভালো
দিনে জ্বলে স্ট্রীট লাইট রাতে আঁধার কালো
ধুতি সেথা হলুদ বরণ—

চুলের রঙ ঘোলা
সাদা মোজেক পান ছোপান
জলের এমন লীলা।
তামিল নাড়ুর ফার্স্ট প্রাইজ
পাওয়া তবু সোজা
বাস ষ্টপেতে হন্যে হয়ে
বৃথাই বাস খোঁজা
বিদ্যালয়ের ঠাঁই সেথা নেই
আছে বনের হরিণ
লোহার খাঁচায় দৈত্য দানো
তামাসাটা রঙীন
লবণহ্রদের মজার কথা
বলবো কত আর
বাড়ী করলে যায় না থাকা
না করলে তিরস্কার।

ওয়েলফেয়ার এ্যাসোসিয়েশনের দুর্গোৎসব সমিতির সভাপতি হলেন শ্রীরঞ্জিৎকুমার মুখার্জ্জী—ইনি মূল সমিতিরও সভাপতি। সম্পাদক হলেন শ্রীঅজিত হালদার, মূল সমিতির সাধারণ সম্পাদক হলেন শ্রীদেবাশীষ গুপ্ত।

অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে পরিচালিত দুর্গাপূজার আয়ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা করে দেখা যায় এদের ক্রমবর্ধমান জাঁকজমকের বিস্তার।

আয়	১৯৭৫ সাল	১৯৭৬ সাল	১৯৭৯ সাল
চাঁদা আদায়	৫০৬৭ টাকা	৬৭০৩ টাকা	৮২৩২ টাকা
বিজ্ঞাপন বাবদ	১০৯৮৫ টাকা	১১০৫৬ টাকা	১৩২৮৫ টাকা
পূজার শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান ইত্যাদি	৫১৪৭ টাকা	৬১১১ টাকা	৭৬০৫ টাকা
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান	৪৩৫৪ টাকা	৫৩২৫ টাকা	৮৭৯২ টাকা
স্যুভেনির মুদ্রণ	২৫৭৩ টাকা	২৯৯৫ টাকা	৩৫৩৮ টাকা

১৯৭৫ সালে সল্টলেক ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের নবযুগ সূচিত হল সভাপতি শ্রীবিমলরঞ্জন চক্রবর্তী এবং সাধারণ সম্পাদক শ্রীভোলানাথ আইচের পবিচালনার ভার গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে। দুজনেই পশ্চিমবঙ্গ সবকারের উচ্চ এবং সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত। তাঁদের কর্মব্যস্ত জীবনের ফাঁকে ফাঁকে সুষ্ঠু পরিচালনায় দুর্গামণ্ডপ ভরে উঠলো লোকে আর আলোকে, উৎসবে আব অনুষ্ঠানে।

"সমাজের সকলকে নিয়েই আমাদেব শুভ, পবস্পবের সঙ্গে প্রীতির বন্ধন গড়েই আমরা এক হতে পারি। বাঙালী দুর্গোৎসবের এই অর্থেই সার্বজনীন করা চেয়েছিল।" ১৩৮৭ সালের পূজা স্মারকীতে ওয়েলফেয়াব অ্যাসোসিয়েশন সভাপতি তার বক্তব্য বাখলেন।

সল্টলেক ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের কর্মক্ষেত্র কোনও একটি বা দুটি ব্লকেব সমস্যা দূরীকবণের ও বিকাশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়—সামগ্রিকভাবে সল্টলেকের সার্বিক উন্নতি বিকাশই এর লক্ষ্য। এই লক্ষ্যের সার্থক রূপায়ণের জন্য সমস্ত ব্লক কমিটিগুলি ও অন্যান্য জনহিতকর সংস্থার সঙ্গে অ্যাসোসিয়েশনের নিবিড় যোগসূত্র ও সহযোগিতা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এই অ্যাসোসিয়েশনের অনেক সভ্যই বিবিধ ব্লক কমিটির ও অন্যান্য সংস্থার বিশিষ্ট সভ্য—অনেকে পরিচালক সমিতির সঙ্গেও যুক্ত আছেন। ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন বিশেষ করে এইসব সভ্যের মাধ্যমে বিভিন্ন ব্লক কমিটিগুলিও অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে নিবিড় যোগসূত্র স্থাপনের ও সল্টলেকেব সার্বিক উন্নতির কাজে সংহত প্রয়াসের জন্য সচেষ্ট হয়েছে। আমার দৃঢ বিশ্বাস অদূর ভবিষ্যতে সল্টলেক ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন প্রকৃত অর্থে সল্টলেক কেন্দ্রীয় সংস্থা হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সর্বজন স্বীকৃত হবে।"

এই একই স্মারকীতে সম্পাদক সমর চৌধুরী দুচার কথাতে অ্যাসো-সিয়েশনের সফলতার কথা দিয়ে শুরু করলেন—.

"...দীর্ঘদিনের ঝুলে থাকা ট্যাক্সের বিষয়টির অবশেষে ফয়সালা হয়েছে। এ ব্যাপারে আমাদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও কর্তৃপক্ষের সঙ্গে লড়াইতে

নামতে হয়েছিল, আর সে লড়াইএ আমরা জিতেছি। ৮-৯-৮০ তারিখে মহামান্য হাইকোর্টের রায়ে উভয় পক্ষে সন্ধি স্থাপিত হয়েছে। সন্ধির শর্তগুলি সংক্ষেপে দেওয়া হলো :—

১। Annual valuation এর বিরুদ্ধে আপীল করতে Court-fee লাগিবে না।

২। Annual valuation নির্ধারণ করতে সরকারের কাছ থেকে যে মূল্যে জমি কেনা হয়েছে, তাই গ্রাহ্য হবে। বাড়ী তৈরীর খরচ হিসাব করতে ১-১-৭৭ থেকে একতলার জন্যে প্রতি বর্গফুট ৪০ টাকা এবং তদূর্দ্ধ তলের জন্য প্রতিতলের জন্যে প্রতিবর্গফুট ৩৫ টাকা ধরা হবে।

৩। যতদিন পর্যন্ত পৌর সুযোগ সুবিধা পুরোপুরি দেওয়া না হবে, ততদিন পর্যন্ত Holding Tax ও garbage Tax মোট ধার্য Tax এর এক চতুর্থাংশ হিসাবে দেয়।

৪। বকেয়া Tax (১-১-৭৭ থেকে) ও চলতি tax প্রতিতিন মাস অন্তর ১ : ১ হারে দেয়।

এই সালের স্মরণিকাতে শ্রীসঞ্জীব সিংহ বিধাননগর কড়চাতে লিখলেন :—

আজ বিধানরায়ের হৃদয় টুটে কখন আপন
তুমি এই কিম্ভুতে উঠলে গড়ে বিধাননগরী ॥
ওগো মা তোমার পথে ঘাটে গরু মোষ চরে
তোমার আনাচে কানাচে ভরে গেছে চোলাই কারবারে ॥
ডানদিকে তোর এঁদোখালে মগ হাতে যায় দলে দলে
মশার চালে রেরিং পশার পুরো শীতকালে ॥
তোমার অট্টালিকা অট্টহাসে কালো টাকার থলে
মাথা খুঁড়েও মধ্যবিত্তের ঠাঁই সেথা না মিলে ॥
তোমার বাজারগুলো ঘুঘুর বাসা পকেট কাটার সেরা।
থলি হাতে শুধুই যাওয়া বৃথাই ঘোরা ফেরা ॥

চুরি, ছিনতাই রাহাজানি রোজই ঘটে সবাই জানি
তবু বোবা কালা ছেলের মাতা সবই নিই মানি ॥
আজি সুখের দিনে সকল জনে মেলাও সুরে তারি
যেন বিধানরায়ের স্বপ্ন সফল করতে সবে পারি।

ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের পূজামণ্ডপে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয় প্রায় পক্ষব্যাপী।

দ্বাদশ অধ্যায়

সংগঠনের মঞ্চে

ভারতীয় বিদ্যা ভবন

রাষ্ট্রপতি শ্রী নীলম সঞ্জীব রেড্ডি ৬ই ডিসেম্বর, ১৯৮০ সালে ভারতীয় বিদ্যাভবনের একটি কেন্দ্রে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন শহর লবণহ্রদের তৃতীয় সেক্টারে। তাঁর ভাষণে রাষ্ট্রপতি আহ্বান জানালেন জাতির উদ্দেশ্যে ভারতের আগামী দিনের নাগরিক শিশুদের প্রতি দৃষ্টি দিতে—ভবিষ্যৎ বংশধর যাতে দেশের ও দশের কল্যাণ-যজ্ঞে নিজেদের আহুতি দিতে পারে। শিশুদের গড়ে তুলতে হবে নির্ভুল পথে, গড়ে তুলতে হবে সুপরিকল্পিত শিক্ষার মাধ্যমে—সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্ পরিবেশের মধ্যে। রাষ্ট্রপতি বললেন যে শৈশব হলো প্রকৃষ্ট সময় যখন সুচিন্তিত শিক্ষার মাধ্যমে যদি একবার শিশুদের চরিত্র গঠন করা যায়, তবে ভবিষ্যতে বহু সমস্যার সুসমাধান অতি সহজেই সম্ভবপর।

এই প্রসঙ্গে কলকাতার প্রশংসা করে বল্লেন যে এটি একটি সর্ব-ভারতীয় শহর, শহর লবণহ্রদের বিদ্যাভবন কেন্দ্র একদিন দেশের গৌরব-স্থান হয়ে উঠবে, এটাই তিনি আশা করেন।

বিদ্যাভবনের কর্মাধ্যক্ষ তার ভাষণে বললেন যে শহর লবণহ্রদের কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা শুধুমাত্র একটি সংখ্যার বৃদ্ধি নয়—এটি একটি নতুন শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সূচনা। বিদ্যাভবন কেবলমাত্র একটি প্রতিষ্ঠান নয়—এটি ভারতীয় সংস্কৃতির একটি বাস্তবরূপ। বিদ্যাভবন কর্ম ও সাধনার এক অপূর্ব সংমিশ্রণ।. শহর লবণহ্রদের প্রস্তাবিত কেন্দ্রটির প্রতিচিত্র রচয়িতা প্রখ্যাত স্থপতি কোঠারী এবং সহকর্মী প্রতিষ্ঠান।

কেন্দ্রের প্রধান উদ্দেশ্য আত্মিক ও নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এক নতুন সমাজ সংগঠন। অতীত বর্তমান এবং ভবিষ্যতের মধ্যে

অবিচ্ছেদ্য সংযোগ স্থাপন হলে দৃঢ় ভিত্তির উপর গড়ে উঠবে এক নূতন ভারতীয় সংস্কৃতি, সমন্বয়ের ভিত্তিতে।

ভারতীয় বিদ্যাভবনের শাখা ছড়িয়ে পড়েছে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে—ভারতের বাইরে গীতা এবং উপনিষদের বাণী প্রচারের জন্য প্রায় ৮০০ শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ভারতীয় বিদ্যাভবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত ছাত্রের সংখ্যা প্রায় ২ লক্ষ এবং শিক্ষকের সংখ্যা ২৫০০ ছাড়িয়ে গেছে। কিণ্ডারগার্টেন থেকে শুরু করে স্নাতকোত্তর পর্যন্ত সর্ববিষয়ের শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। ভারতীয় ভবনের জনক কুলপতি কে, এম, মুন্সী কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ১৯৩৮ সালে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে ভারতের মৌলিক সংস্কৃতি বিস্তারের উদ্দেশ্যে।

শহর লবণহ্রদের বিস্তারিত প্রতিচিত্রে স্থান পেয়েছে সম্পূর্ণাঙ্গ শহরের যাবতীয় প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানগুলি। এর মধ্যে আছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, আছে খেলাধূলার জন্য নির্দ্দিষ্ট পার্ক, আছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য মুক্ত অঙ্গন, উদয়শঙ্করের নৃত্য ব্যবস্থা, আরও কত কি। এছাড়া থাকবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মূল অফিস এবং কেন্দ্রের শাখা অফিসগুলি।

বি. ডি ব্লকের শিশুমিলনীর প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমতী সুনীতি পাকড়াশীর সঙ্গে দেখা হলো। শহর লবণহ্রদে শিশুশিক্ষায় যে কটি প্রতিষ্ঠান অগ্রণী, তার মধ্যে শিশুমিলনী অন্যতম—এছাড়া শিশুদের শিক্ষার ভার যাঁরা নিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে আছে—নাইটিঙ্গেল, সিষ্টার মার্গারেট স্কুল, সল্ট পয়েন্ট, সল্টলেক পয়েন্ট, আরোও নাম-না জানা কয়েকটি। দেখা হতেই সম্বর্ধনা—সম্বর্ধনার পালা শেষ হতেই শিশু-মিলনীর কথাপ্রসঙ্গে বল্লেন যে শিশুমিলনী তাঁর কাছে এক বিরাট পুতুল খেলা। জানালেন যে তাঁর অর্থের ঈপ্সা আছে—কিন্তু লিপ্সা নেই। বেশ খানিকটা জোর দিয়ে বল্লেন যে শিশুমিলনীর প্রতিষ্ঠানের পেছনে বিন্দুমাত্র অর্থকরী উদ্দেশ্য ছিল না। নিজে অবসরপ্রাপ্ত উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী, মানানসই একখানা বাড়ী, ঝামেলাবিহীন জীবন। শিশুকে গড়ে তোলার মধ্যেই এক আনন্দ খুঁজে পেলেন। শিশুমিলনী পরিচালনায় দোসর

হিসাবে পেয়েছিলেন শ্রীমতী প্রতিমা রায়কে—প্রতিষ্ঠানটির নামকরণ তিনিই করেছিলেন। এর প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিলেন শ্রীমতী নীলিমা ব্যানার্জী।

বর্তমান ছাত্র সংখ্যা ৩৫—এটাই হলো এদের সীমারেখা। নার্সারী শিক্ষা পদ্ধতি চালু রয়েছে এখানে—শিক্ষার সরঞ্জামও বেশ কিছু আছে। খেলাধূলার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয়। এখানকার অনেকেই কোলকাতার প্রতিষ্ঠাবান বিদ্যালয়গুলিতে স্থান পেয়েছে। উদাহরণ, ডনবস্কো, হিন্দু ও হেয়ার। ২॥ বছর থেকে ৬ বছর বয়সের শিশুদের এখানে ভর্ত্তি করা হয়।

শ্রীমতী পাকড়াশী শুধু শিশুর ভবিষ্যৎ নিয়েই মাথা ঘামান না—শিশুর মায়েদের ভবিষ্যৎ চিন্তাও তাকে উদ্বুদ্ধ করেছে মহিলা সমিতি সংগঠন করতে।

অল ইণ্ডিয়া উইমেনস কনফারেন্সের সল্টলেক শাখার প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমতী পাকড়াশী। ১৯৮০ সালের ১৬ই জুন এই মহিলা শাখাটিকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সোসাইটি অ্যাক্ট অনুসারে নিবন্ধভুক্তি করা হয়েছে। মহিলাশাখার প্রারম্ভিক সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন সর্বশ্রীমতী সুনীতি পাকড়াশী, বকুল দত্ত, প্রতিমা রায়, সতী বসুমল্লিক, নীলিমা ব্যানার্জী, রমা রায় ও শেফালী পাল।

এদের মধ্যে শ্রীমতী সুনীতি পাকড়াশী হলেন প্রথম সভাপতি এবং শ্রীমতী সতী বসুমল্লিক হলেন সম্পাদক।

মহিলা সমিতির চাঁদার হার—সাধারণ সভ্যের বার্ষিক ৬ টাকা আর কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্যদের চাঁদা বার্ষিক ১২ টাকা—এছাড়া আজীবন সভ্যের চাঁদার হার ১০০ টাকা।

অখিল ভারতীয় মহিলা সমিতির সভাপতি শ্রীমতী সরোজনী বরদাপ্পা। এদের অধীনে বিভিন্ন প্রদেশে একটি করে প্রাদেশিক নির্বাচন কেন্দ্র আছে। সেইসব প্রাদেশিক কেন্দ্রীয় সমিতির অধীনে আবার শাখা সমিতি গঠিত হয়। সল্টলেক মহিলা সমিতি পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতির অধীনে একটি শাখাবিশেষ। কেন্দ্রীয় সমিতির মুখপাত্র

'রোশনী' একটি দ্বিমাসিক পত্রিকা।

পশ্চিমবঙ্গে ২টি পৃথক শাখা রয়েছে। একটি মেট্রোপলিটান শাখা, এর অধীনে আছে উত্তর এবং মধ্য কলকাতার অন্তর্গত মহিলা সমিতিগুলি, আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে দক্ষিণ কলিকাতা মহিলা সমিতি—তারই অধীনে রয়েছে সল্টলেক মহিলা সমিতি। এ ছাড়া লেকটাউন, বেলেঘাটা, ভবানীপুর, নিউ আলিপুর প্রভৃতি শাখা সমিতিগুলি।

সল্টলেক মহিলা সমিতির বর্তমান সভ্যসংখ্যা ১১০। এই শাখার পরিচালনাধীনে আছে একটি লাইব্রেরী, একটি সেলাই স্কুল, একটি যোগব্যায়াম শিক্ষাকেন্দ্র, নন্ ফর্মাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। লাইব্রেরীতে সংগৃহীত পুস্তকের সংখ্যা ১৬০০ অধিকাংশই পাওয়া গেছে লেখক এবং লবণহ্রদের অধিবাসীবৃন্দের কাছ থেকে। কিছু বই নগদ দামেও কেনা হয়েছে। লাইব্রেরীর পাঠকদের মাসিক চাঁদা ২ টাকা এবং বই বাড়ীতে নিতে হলে কিছু জমা দিতে হয়, পাঠক সংখ্যা ৫৬।

সেলাই স্কুলে আছে ১৫টি ছাত্রী অধিকাংশই এখানকার বাসিন্দা।

এছাড়া একটী নন্‌ফর্মাল শিক্ষাকেন্দ্র মহিলা সমিতির পরিচালনাধীন। যে সব মহিলারা অথবা ছোট ছোট মেয়েরা অর্থাভাবে বা অন্য যে কোন কারণে পড়াশোনায় অগ্রসর হতে পারেনি, তাদের নিয়মিত শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখানে যেসব শিক্ষক শিক্ষকতাকার্যে লিপ্ত থাকে তাদের নিয়মিত বেতন সরকার থেকে দেওয়া হয়ে থাকে। সরকারি পরিচালনায় এই সব স্থলে যাদের নিয়োগ করা হয়, তাদের জন্যে ১৫ দিনের একটি বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয় যাতে তারা নন্‌ফর্মাল স্কুলের ছাত্রীদের বিজ্ঞানসম্মতভাবে শিক্ষা দিতে পারে।

যোগ ব্যায়াম শেখানোরও ব্যবস্থা করেছে মহিলা সমিতির এই শাখা কেন্দ্রটি। ফুলবাগানের যোগব্যায়াম শিক্ষা কেন্দ্রের সুযোগ্য পরিচালক শ্রীমনোতোষ চৌধুরী নিজে এই কেন্দ্রটি পরিচালনার ভার নিয়েছেন এবং যখনই কোন নতুন ছাত্রী যোগব্যায়াম শিক্ষাকেন্দ্রে ভর্ত্তি হয়, তখনই মনোতোষবাবু নিজে এসে কি ধরণের ব্যায়াম নবাগত ছাত্রীর

শরীরের পক্ষে উপযুক্ত হবে তার সঠিক নির্দেশ ব্যবস্থাপত্রে লিপিবদ্ধ করে যান এবং মাঝে মাঝে এসে পরিদর্শন করে শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণাধীন রাখেন।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীমতী পাকড়াশী জানালেন যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সি. এম. ডিএর মাধ্যমে এ. ডি ব্লকের পার্কের সংলগ্ন ২ কাঠা জমি মহিলা সমিতির জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছে। ওদের জমির সঙ্গে লাগোয়া আরোও ২টি প্রতিষ্ঠানকে জমি বিলি করা হয়েছে। একটি প্রজ্ঞানন্দ কেন্দ্রকে আর একটি এ. ডি ব্লককে। শ্রীমতী পাকড়াশী এটাও জানালেন যে জমির দাম এককালীন দিতে হবে এবং যেটা দেওয়া নবজাত মহিলা সমিতির পক্ষে খুবই কষ্টসাধ্য। ২ কাঠা জমির দাম ধার্য করা হয়েছে ১০ হাজার টাকা এবং তা এককালীন দেয়।

একদিকে যেমন সামাজিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, অন্যদিকে সংগঠিত হয়েছে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। অবসরপ্রাপ্ত লোকের ভীড়—কর্মজীবনের অবসানের পরে পুণ্যলোভীর দল ছুটে চলেছে আশ্রয়ের সন্ধানে। কেউ পেলো আশ্রয় ওঁকারনাথের চরণে, কেউ বা পেলো অনুকূল ঠাকুরের চরণে আশ্রয়। শ্রীঅরবিন্দের নতুন জীবন দর্শনের অনুপ্রেরণায় দলবদ্ধ হলো একদল—এমনি করে দল গঠিত হলো ধর্মীয় প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে ছাড়িয়ে গঙ্গাজল বিধৌত ও গঙ্গামাটিতে বিশোধিত এই পুণ্যশহর লবণহ্রদে প্রতিষ্ঠিত হলো শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্র শহর লবণহ্রদের প্রতিটি ধূলিকণা ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের ও বিবেকানন্দের পদরেণুর সহিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট।

১৯৭৫ সালের ৮ই মার্চ বিধাননগর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্রের জন্মদিন। এই কেন্দ্রটি ভারতীয় কৃষ্টি ও ভারতীয় অধ্যাত্ম দর্শনের অনুপ্রেরণায় হয়েছে প্রতিষ্ঠিত। কেন্দ্রের মূলমন্ত্র হলো শহর লবণহ্রদের নবাগত অধিবাসীদের মধ্যে চির উন্মাদ প্রেমপাথার শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী প্রচার করা, সুগমাতা সারদেশ্বরী সর্বভয়হরা বিশ্বমাতৃকার স্বতঃ উৎসারিত অন্তরের উপদেশামৃত বিতরণ করে ভক্তদের মধ্যে করুণার প্লাবন বইয়ে

দেওয়া—আর স্বামীজীর তেজোদ্দীপ্ত অগ্নিময় বাণীর দ্বারা সমাজের মধ্যে অগ্নিবীণার ঝঙ্কার তোলা। এই সংগঠনটি শুধুমাত্র ধর্মীয় আলোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এটি একটি সর্বাঙ্গীন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র।

কেন্দ্রের কর্মসূচীর মধ্যে প্রধান আকর্ষণ হলো সাপ্তাহিক শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃত পাঠ ও ভজন—এটি অনুষ্ঠিত হয় প্রতি শনিবার ভক্তদের গৃহে—পর্যায়ক্রমে। এছাড়া প্রতি শনিবার সন্ধ্যায় সি, ই. ৬২ নং বাড়ীতে বিশেষ পাঠচক্রের অনুষ্ঠান। নিয়মিত পৌরোহিত্য করেন বরানগর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী মহানন্দজী। ভক্তদের ধর্মগ্রন্থ পাঠাভ্যাসের সুবিধার জন্যে বি. ডি. ১২৩ নং বাড়ীতে একটি অস্থায়ী লাইব্রেরী স্থাপন করা হয়েছে।

কেন্দ্রটির সদস্য সংখ্যা হলো ২১৮—আজীবন সদস্য সংখ্যা ১৮৮ আর সাধারণ সভ্য সংখ্যা—৩০।

নরনারায়ণ সেবা এদের কর্মসূচীর একটি বিশেষ অঙ্গ। ১৯৭৭ সালের প্রলয়ঙ্করী বন্যার সময়ে ত্রাণকার্যে ঝাপিয়ে পড়েছিলো সদস্যরা।

বিধাননগর ১নং সেণ্টারে ৪৪ নং প্লটে ১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট থেকে দশ কাঠা জমি নেওয়া হয়েছে এবং এই জমির উপর কেন্দ্রের স্থায়ী ভবনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করলেন শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ ৩০শে এপ্রিল বুদ্ধ পূর্ণিমার পুণ্য তিথিতে। শ্রীশ্রী ঠাকুরের প্রসাদী নির্মাল্য নিয়ে প্রোথিত হলো সঙ্ঘগুরু বীরেশ্বরানন্দজীর আশীর্বাদপূত ভিত্তিফলক। ২৯শে এপ্রিল থেকে ১লা মে পর্য্যন্ত অনুষ্ঠিত হলো কেন্দ্রের পঞ্চম বার্ষিক উৎসব—উপস্থিত ছিলেন অগণিত ভক্ত সম্প্রদায় এবং এক বিরাট জনসমাবেশের উপস্থিতিতে কেন্দ্রের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়।

এই উপলক্ষে নির্মিত বিরাট মণ্ডপের দেয়ালে শোভা পাচ্ছিলো রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ও শ্রীমার বাণীগুলি।

এখানে ২।১ টির উল্লেখ করবার লোভ সামলাতে পারলাম না।

"সংসারের মধ্যে বাস করে যিনি সাধনা করতে পারেন, তিনিই বীর সাধক। বীরপুরুষ যেমন মাথায় বোঝা নিয়ে আবার অন্যদিকে তাকাতে পারে, বীর সাধক তেমনি এ সংসারের বোঝা কাঁধে করে ভগবানের দিকে চেয়ে থাকে।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

"আমাদের এমন ধর্ম চাই যাহা আমাদিগকে মানুষ করিতে পারে। আমাদের এমন সব মতবাদ আবশ্যক যেগুলি আমাদিগকে গড়িয়া তোলে। যাহাতে মানুষ গঠিত হয়, এমন সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ শিক্ষার প্রয়োজন।

—স্বামী বিবেকানন্দ

"ভাঙতে সবাই পারে, গড়তে পারে কজন? নিন্দা ঠাট্টা করিতে পারে সবাই, কিন্তু ভাল করতে পারে ক'জন?"

— শ্রীশ্রী সারদাদেবী

শহর লবণহ্রদ তড়বড়িয়ে বেড়ে চলেছে, তরতাজা রাস্তাগুলি সন্ধ্যার আলোয় ঝলমল করে, অবশ্য লোডশেডিং-এর খপ্পরে না পড়লে। এই ঝলমলে রাস্তা ধরে সোজা পূর্বদিকে এগিয়ে গেলে পৌঁছে যাবেন ঝিলমিলে—অবশ্য ততক্ষণ ঝিলমিল বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ঝিলমিল খোলা থাকে সব দিনই, সোমবার ও শুক্রবার বাদে সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত। ৩-৩০ মিঃ। এর পরে প্রবেশ দ্বার বন্ধ। এস ১৪ গড়িয়া থেকে রওনা হয়ে শহর কলকাতার দক্ষিণপ্রান্তের প্রায় সমস্ত পাড়াগুলো পরিক্রমা করে সল্টলেকের মধ্যে দিয়ে করুণাময়ীর গা ঘেঁষে একেবারে ঝিলমিলের দোরগোড়ায় নামিয়ে দেবে। ৫০ পয়সা দক্ষিণা দিয়ে ভিতরে চলে যান —সামনের দিকে তাকালেই দেখতে পাবেন টয়-ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে আপনারই জন্যে। প্রবেশ পথ দিয়ে প্রবেশ করেই সামনের নোটিশটি ভালো করে পড়ে নেবেন। বিস্তারিত নির্দেশ দেওয়া আছে। সাপের সমাবেশ দেখতে হলে লাগবে ৩০ পয়সা। ট্রেন চলাচল নিয়ন্ত্রণের জন্য আছে ষ্টেশন ঘর, আছে হোম সিগন্যাল আর ডিষ্টাণ্ট সিগন্যালের ব্যবস্থা। টিকিট কাউন্টারে বসে আছেন সন্ত্রস্ত ষ্টেশন মাষ্টার। টয়ট্রেন যদিও শিশুদের জন্যে কিন্তু শিশুর বাবারাও অমান্য করে গাড়ীতে বসে পড়েন

আগেভাগে পাছে শিশু সমেত গাড়ীটা ডিরেল্ড হয়ে যায়—তবে ভয়ের কিছু নেই—শিশুর বাবারা তখন কাজে লাগে, নেমে এসে ধরাধরি করে আবার গাড়ীটাকে লাইনের ওপর দাঁড় করিয়ে দেয়—আবার যাত্রা শুরু হয়।

টয়ট্রেণে ঝিলমিল পরিক্রমা করে আবার আসুন ষ্টেশন প্ল্যাটফর্মে, মাঝে নেমে যেতে পারবেন একটা ছোট প্ল্যাটফর্মে—সেখানে তার দিয়ে ঘেরা বেশ খানিকটা জায়গা নিয়ে সাপের আবেস্টনী করা হয়েছে। কতক সাপ রাখা আছে খোলা জায়গায় কংক্রীটের দেয়াল দিয়ে ঘেরা—আবার কিছু রাখা হয়েছে সংরক্ষিত ছোট ছোট খুপরির মধ্যে—আবার কতক আছে নিশ্চিন্ত আরামে কাঁচের বাক্সে। হেলে, গোখুড়া, চন্দ্রবোড়া, তক্ষক; শীতের মিষ্টিরোদে গা এলিয়ে দিয়ে পড়ে আছে কংক্রীটের আস্তানার মধ্যে উন্মুক্ত আকাশের নীচে। কালনাগিনী, বেতআছড়া, শাখামুটি, লাউডগা, বালি বোড়া, কালাজ এরা কাঁচের খাচায় বন্দী, কেউটিয়া, তুতুর, দাঁড়াশ, ময়াল আর শঙ্খচূড় আছে, শক্ত তারের জালে ঘেড়া খুপরির মধ্যে।

সাপের আস্তানা ছাড়িয়ে বাঁদিকে খানিকটা এগিয়ে গেলে দেখতে পাবেন হরিণের আস্তানা। গুটিতিনেক হরিণ বিভ্রান্ত জীবন কাটাচ্ছে সীমিত গণ্ডীর মধ্যে—না আছে তাদের উপযুক্ত পরিবেশ, না আছে উপযুক্ত সঙ্গী সঙ্গিনী, ঢুকতেই ডানদিকে বিরাট লোহার খাঁচা তৈরী হচ্ছে পক্ষিশালার জন্যে।

লবণহ্রদের একটি বিশেষ আকর্ষণ হলো সন্তরন সঙ্ঘ—সুইমিং পুল তৈরী হয়েছে সঙ্ঘেব সুপরিচালনায়। শহর লবণহ্রদের গোড়াপত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই এটা গড়ে উঠেছে সল্টলেক কর্তৃপক্ষের প্রচেষ্টায়। শ্রীযুক্ত ডি. পি. চ্যাটার্জির নির্দেশনায় একটি ব্লু প্রিণ্ট রচিত হল সুইমিং পুলের।

বিদ্যাসাগর সমবায় আবাসন সমিতির রেজিষ্ট্রেশন হয় ১৯৬৬ সালের ১৯শে অক্টোবর এবং লবণহ্রদে যখন এঁদের প্রস্তুতি পর্ব চলছে তখন রেজিষ্টার্ড অফিস ছিল ১০ রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

১৯৭০ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারীর সাধারণ সভার বিবরণীতে দেখা যায় যে লবণহ্রদের বালুর মাঠে, বাসা বাঁধার ব্যাপারে অনেকের মনেই সংশয় ছিল প্রচুর—এবং কোন কোনও সভ্য তাঁদের আবাসনের জন্য জমা দেওয়া টাকা তুলে নিয়েছিলেন। আবাসন সমিতি Cementation Company Ltd. এর পরামর্শ নিলেন—সমিতির অভিজ্ঞ সভ্যদের উপদেশ নিলেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অভিমত নিলেন—এসবের ভিত্তি করে তাঁরা এগিয়ে চললেন দ্রুতগতিতে রূপায়ণের পরিসমাপ্তির দিকে। ফলে অনেকেরই জেগে ওঠা সংশয় কেটে গেলো, তাঁরা আবার ফিরে এলেন, যোগ দিলেন সমবায় সমিতিতে। গড়ে উঠলো বিদ্যাসাগর নিকেতন—সম্ভব হলো Building Castles on the sand পরিকল্পনার। ১৯৭৯ সালে শুরু হলো নবাগন্তুকের নবনির্মিত গৃহে গৃহপ্রবেশের উৎসব। বালুর মাঠের আকাশ বাতাস প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠলো মঙ্গলশঙ্খ আর হুলুধ্বনিতে, শহর লবণহ্রদ তরতরিয়ে বেড়ে উঠলো বিদ্যাসাগরের পদাঙ্ক অনুসরণ করে।

১৯৬৯ সালে এঁদের সভ্যসংখ্যা ছিল ১৯৭, ১৯৭৭ সালে ২০৯। ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত ঐ একই সংখ্যা আছে।

১৯৬৯ সালের হিসাব নিকাশ পত্রে দেখা যায় এঁদের সম্পত্তির ও আদায়ের পরিমাণ ২১, ৩১, ২২১, ৯০ লাখ। এটাই ১৯৭৭ সালে দাঁড়িয়েছে ৭০৯৭, ৮৬৫, ৪৯।

১৯৬৮ সালে সভাপতি ছিলেন শ্রীবিনয়ভূষণ মুখার্জি এবং সম্পাদক শ্রীভবদেব ভট্টাচার্য্য।

১৯৭৭ সালে সভাপতি হলেন শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দাশ এবং সম্পাদক শ্রীঅজয় কুমার গুপ্ত।

বিদ্যাসাগর সমবায় আবাসন সমিতির পরিচালনায় বিদ্যাসাগর নিকেতনে সার্বজনীন দুর্গোৎসব প্রতিবছর অনুষ্ঠিত হয় জাঁকজমকের সঙ্গে।

কর্মসমিতির পক্ষে নিশীথরঞ্জন চাকী—সম্পাদক, নিবেদন রাখলেন ১৩৮৭ সালের স্মরনিকায়।

'আসুন একান্ত সীমিত সঙ্গতির মধ্যে যেটুকু সম্ভব তা করতে চেষ্টা করি। দেশব্যাপী নৈরাশ্যের অন্ধকারে সামান্য ক'দিন মা দুর্গার আরাধনায় একটু আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করি ও দুঃখ বেদনা ভুলে থাকতে চেষ্টা করি।

"রূপং দেহি জয়ং দেহি"—এখন চাই না, মার কাছে দুঃখ বেদনা দূর হোক, নৈরাশ্যের অন্ধকার দূরীভূত হয়ে জ্যোর্তিময় হোক, ভুলে যাই না পাবার কথা।

১৩৮৭ সালের কার্যকরী সমিতির সভাপতির আসনে শ্রীভাস্কর চক্রবর্ত্তী এবং সম্পাদকের আসনে শ্রীনিশীথ রঞ্জন চাকী।

আয় ব্যয়ের হিসাব—

চাঁদা আদায়	৪৩১৫ টাকা
বিজ্ঞাপন বাবদ	৬১৬০ টাকা
পূজার শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান বেদী, আলো, ইত্যাদি	৫১৯৬ টাকা
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান	৪৪৫৮ টাকা
স্মরনিকা মুদ্রণ	১০০০ টাকা

লবণহ্রদের বুকে যৌবনের অভিযান শুরু হলো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে—খেলাধুলার মাধ্যমে। এই অভিযানের পুরোভাগে দেখা দিল এক উদিত ভাস্কর, 'সপ্তরশ্মি' সঙ্গীত, নর্ত্তনে, নাট্যে, ক্রীড়নে, সমাজ-সেবায়, নাচে, গানে, নাটকে, খেলায়, সেবায় এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখা দিল নতুন শহরের নতুন পরিবেশ।

১৯৮ সালের চতুর্থ বার্ষিকী স্মরনিকায় সভ্য গৌতম সান্যাল। সপ্তরশ্মির আবির্ভাবের প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গে বললেন—লবণহ্রদে নতুন গড়ে ওঠা প্রতিষ্ঠানগুলির সব আসনগুলিই দখল করে নিল বার্দ্ধক্য—তাই বিক্ষুব্ধ যৌবন গড়ে তুললো সপ্তরশ্মি—ঘোষণা করলো যৌবনের জয়যাত্রা।

সপ্তরশ্মির সভাপতি, সম্পাদক ও যুগ্ম-সম্পাদকের ভাষণে সঙ্ঘের

উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে এটা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে যে শহর ও শহরতলিতে ক্রমবিকাশমান অপসংস্কৃতির উন্মাদনার অগ্রগতি বন্ধ করে সত্যম, শিবম সুন্দরম এর ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করা একটি সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর সুস্থ সংস্কৃতি।

লাবণি আবাসিক সমিতি : ১২ একর জমির ওপর লাবণির পত্তন হলো পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হাউসিং বোর্ডের পরিচালনায়। ১৯৭৪ সালে লাবণি আবাসন, আবাসিকে পরিণত হলো সাতশত অ্যাপার্টমেণ্টের প্রায় ৪ হাজার বাসিন্দাকে নিয়ে। এই সাতশত পরিবার তাদের সংসার বিছিয়ে নিতে লাগলো ৮৪৬, ২১৪ স্কোয়ার মিটার ভিত। ক্রেতাদের আর্থিক সঙ্গতির সঙ্গে তাল রেখে আট রকমের কাঠামো রূপায়িত হলো। ৬৩টি চারতলা কোঠা বাড়ী মাথা তুলে দাঁড়ালো লবণহ্রদের লবনাক্ত আস্বাদ শুষে নিয়ে লাবণি ও তার লাবণ্য ছড়িয়ে পড়লো দেশবিদেশে। বহু পরিবার এসে বাসা বাঁধলো বিদেশ থেকে তল্পিতল্পা গুটিয়ে। বাড়ীগুলোকে ভাগ করা হলো ১০টা গ্রুপে, ইংরেজী অক্ষর বুকে এঁটে 'এ থেকে জে' পর্যন্ত।

মোট খরচ হলো ২ কোটি পঁচিশ লক্ষ ছয় হাজার ষাট টাকা।

লাবণি আবাসিক সমিতি রূপান্তরিত হলো 'লাস' এ (Las), লাবণি হয়ে দাঁড়ালো একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসস্থল। এর সবকিছুই 'লাসের' কর্তৃত্বাধীন। এদের গণ্ডীর মধ্যে সবকিছুই ছড়িয়ে আছে। দোকান আছে, বাজার আছে, স্কুল আছে, ক্লাব আছে। এর পরিচালনার ভার দেওয়া হয়েছে একটি পরিচালক মণ্ডলীর ওপর। ১৯৭৯-৮০ সালে পরিচালক মণ্ডলীর সভাপতি হলেন শ্রী এস. কে দাসগুপ্ত এবং সম্পাদক হলেন শ্রী পি. কে ব্যানার্জী।

১৯৭৯-৮০ সালের সাধারণ পরিবেশিত বার্ষিক বিবরণীতে দেখা যায় যে ৭০০ পরিবার প্রাচীর বেষ্টিত একই অঙ্গনে বাস করার মধ্যে যেমন থাকে মাধুর্য্য, তেমনি ঔদার্য্য। দিনগুলি হয়ে ওঠে আনন্দোচ্ছল, পরিবেশ হয় সুখ-সমৃদ্ধ তেমনি মানুষের অন্তরের অন্তস্থলে চেপে রাখা

আদিম প্রবৃত্তিগুলি হয়ে ওঠে সজাগ, সুযোগ পেয়ে জেগে ওঠে। সঙ্ঘবদ্ধ জীবনে ছড়িয়ে দেয় পঙ্কিলতা, কলুষতা—এই কথাগুলিই সুস্পষ্ট-ভাবে প্রকাশ পেয়েছে সভাপতির ভাষণে।

শহর লবণহ্রদে আস্তে আস্তে জেগে উঠেছে যৌবনের উচ্ছ্বাস, যৌবনের উদ্দীপনা—বিদ্যাসাগর নিকেতনে প্রতিষ্ঠিত হলো Vidyasagar Young Boys Association, ১৯৭৫ সালে।

১৯৭৭ এর ডিসেম্বরে লবণহ্রদে প্রথম ক্রীড়া প্রতিযোগীতার প্রবর্ত্তন করেন V. Y. B. A। ১৯৭৮ সালে এদের উদ্যোগে এবং পরিচালনায় ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয় বালুব মাঠে—এটা চলে প্রতিবছর, ১৯৮১ সালে খেলাধূলার সঙ্গে যোগ করে দিলেন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

Vidyasagar Young Boys Association এর সভাপতি শ্রী অমিতাভ দাশগুপ্ত এবং সম্পাদক হচ্ছেন শ্রী অমিতাভ চাকী। এঁদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় শিশু প্রতিষ্ঠানটি এগিয়ে চলেছে সাফল্যের পথে, এগিয়ে চলেছে প্রগতির পথে।

১৮ই মার্চ ১৯৮৪, ওয়ার্ল্ড ইউনিয়ন, সল্টলেকের উদ্যোগে World Union Library-র শুভ উদ্বোধন বেশ উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে সুসম্পন্ন হয়ে গেল!

এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত অবনী মোহন কুশারী মহাশয়। মাঙ্গলিক শঙ্খধ্বনির সঙ্গে তিনি পবিত্র প্রদীপ জালিয়ে গ্রন্থাগারের উদ্বোধন করেন।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি বেশ গাম্ভীর্যপূর্ণ অথচ আনন্দময় পরিবেশের মধ্যে পালন করা হয়।

শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দু প্রসাদ ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁর ভাষণে গ্রন্থাগারে এমন সব পুস্তক রাখতে উপদেশ দেন যাতে প্রকৃত জীবন প্রতিফলিত হয়, আদর্শ ও নীতি মনপ্রাণকে উদ্বুদ্ধ করে। যেসব রোমাঞ্চকর ও অবাস্তব-ধর্মী পুস্তক যা মানসিক উন্নতি সাধন করেনা সেগুলি সম্বন্ধে তিনি সতর্ক করে দেন। প্রধান অতিথি গ্রন্থাগারের আবশ্যকতা ও ব্যাপক

প্রচারের কথা উল্লেখ করেন। শ্রীসুশীল রায়চৌধুরী মহাশয় ওজস্বিনী ভাষায় এই গ্রন্থাগারের ক্রমবিকাশের আশা ব্যক্ত করেন ও আরও অনেক সারগর্ভ কথা বলেন।

সম্পাদিকা শ্রীমতী অঞ্জলি রায় তাঁর প্রতিবেদনে সল্টলেকের যেসব অধিবাসীগণ অকুণ্ঠ সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন এবং অকৃপণ হস্তে নানাভাবে আনুকূল্য দেখিয়েছেন তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন এবং বিধাননগরের অধিবাসীদের সকলকে সাদর ও সনির্বন্ধে এই গ্রন্থাগারের সঙ্গে যুক্ত হবার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানান। সভাপতি বক্তাদের বিশেষ দিকগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং বিশ্বমিলনের যে আধ্যাত্মিক পরম সত্য যা শাশ্বত সনাতন সেদিকে লক্ষ্য রেখে গ্রন্থাগার পরিচালনার কথা বলেন।

পরিশিষ্ট

বিশ্বকর্মাদের কয়েকজন

ডি. সি. পাল

সল্টলেক তথা বিধাননগরের কেতাদুরস্ত পরিবেশটি গড়ে তুলতে, লবণহ্রদের ভরাট করা ভেড়ির বুকে আধুনিক স্থাপত্য শিল্পের নিত্য নতুন নিদর্শন এঁকে দিতে, সুন্দর এই শহরটিকে সুন্দরতর করে তুলতে যে সব শিল্পীর অবদান আছে তাদের অন্যতম হলেন ডি সি পাল ওরফে দুলাল চন্দ্র পাল। বিশ্ববিদ্যালযের নির্দিষ্ট স্থাপত্য বিদ্যার পুঁথিগত জ্ঞান আহরণ না করেও, কেবলমাত্র নিজের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়, সৃষ্টি সুখের প্রচণ্ড উন্মাদনায় প্রখ্যাত স্থপতি হওয়া যায় তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল শ্রী দুলালচন্দ্র পাল।

ডি সি পাল তাঁর অসাধারণ শক্তি নিয়ে এগিয়ে চলেছেন দুর্দ্দমনীয় গতিতে, সৃষ্টিসুখের উল্লাসে স্থাপত্য শিল্পের পরীক্ষণ-নীরিক্ষণের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়ে।

১৯৬৮ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনিই সর্ব্বপ্রথম ভিত পূজা করেন বিধাননগরের বালুর মাঠে।

তারপর ১৯৭২ সাল থেকে শুরু হল তাঁর একান্ত নিজস্ব প্রতিভায় ও নিজস্ব আদর্শে বিধাননগরের বুকে নিত্য নব সৃষ্টি—দেখা দিল স্বপ্নাতীত, ফুটে উঠল অনন্যা, গড়ে উঠল বিশ্বশান্তি, রূপায়িত হল আলেখ্য, পদ্মাপার থেকে এল 'বাটানগর'—আটলান্টিক পার হয়ে এল 'হোয়াইট হাউস'।

বর্ত্তমানে তার সুযোগ্য পুত্র, স্থাপত্যশিল্পে তাঁরই কাছে দীক্ষিত—তাঁরই আদর্শে গড়া নবীন শিল্পী প্রশান্ত পাল সবকিছু দেখাশুনা করছেন।
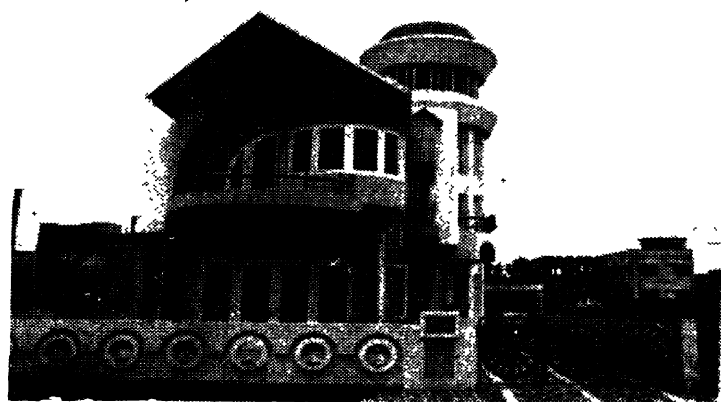
জ্যোতিরঞ্জন রায়

লবণহ্রদের ভবিষ্যত যখন সংশয়ের ধোঁয়াশায় আচ্ছন্ন, বাস্তুকামীরা যখন লবণহ্রদের জমির অস্থিরতায় আতঙ্কিত, সে সময় লবণহ্রদের গৃহনির্মাণ সমস্যা সমাধানে এগিয়ে এলেন তরুণ বাস্তুকার জ্যোতি রঞ্জন রায়। পশ্চিমবঙ্গের রূপকার ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সপ্নসৌধ বিধাননগর গড়ে তোলবার প্রতিশ্রুতি নিয়ে। প্রতিষ্ঠিত হল 'সিকয়' লবণ হ্রদের বালুব ঘাটে জ্যোতি রায়ের একাগ্রতা সততা ও নিষ্ঠার ভিত্তিতে।

লবণ হ্রদে প্রথম বাড়ী তৈরী করলেন লবণ হ্রদ পরিকল্পনার ইঞ্জিনীয়ার জাতেন চক্রবর্ত্তী এ বি ১২৯ নং প্লটে—আর এই এ বি ব্লকেই ১০৭ নং প্লটে লবণ হ্রদের দ্বিতীয় বাড়ীটি তৈরী হল তরুণ বাস্তুকার জ্যোতি রঞ্জন রায়ের হাতে গড়া তাঁর প্রথম বাড়ী। লবণ-হ্রদের ইতিহাসের পাতায় স্বাক্ষরিত হল স্থপতি জ্যোতি রায়ের কীর্ত্তি আর বিধাননগরের ভবিষ্যত বাস্তুকামীরা পেল লবণ হ্রদের এককোণে একখানি বাসা বাঁধবার আশ্বাস। স্থপতি জ্যোতি রায়ের নিরলস প্রচেষ্টায় বাস্তুকামীরা স্বস্তির নিঃশেষ ফেলে তাদের এতদিনের সংশয় নিরসনে। তাঁরা আশীর্ব্বাদ জানাল বাস্তুকার জ্যোতি রায়কে তাঁদের সঙ্কট মোচনে।

জ্যোতি রায়ের প্রতিজ্ঞা রূপায়িত হল 'সিকয়ের' তত্ত্বাবধানে একের পর এক নিত্য নতুন পরিকল্পনায় বিধাননগরের গৃহ নির্মাণে—যার সংখ্যা ছাড়িয়ে গেছে চার হাজারের অঙ্ক ১৯৮৬ সালে। বালুর মাঠ ভরে গেল সবুজ আস্তরণে আর তরতরিয়ে গড়ে উঠল বিধাননগর নিপুণ শিল্পী বাস্তুকার জ্যোতি রায়ের সহজ সরল ব্যক্তিত্ব ও অসামান্য প্রতিভার যাদুস্পর্শে।

সোমনাথ সান্যাল

বি. ই. কলেজ থেকে ১৯৭২ সালে স্থাপত্যবিদ্যায় প্রথম শ্রেণীর ডিগ্রী লাভ করে সোমনাথ সান্যাল ঐ বছরই রূপায়িত করলেন 'মডার্ণ ডিজাইন গ্রুপ' নিজের আদর্শে গড়া, সততা ও নিষ্ঠার ভিত্তিতে সংগঠিত একটি পরিচ্ছন্ন প্রতিষ্ঠান।

নবীন স্থপতিদের শিল্পনৈপুণ্যে লবণহ্রদের বালুর মাঠের বুক চিড়ে নতুন শহর বিধাননগর তরতরিয়ে এগিয়ে চলেছে নবীন সাজে, নতুন পরিচয়ে। এই নতুন শহর সৃষ্টির উন্মাদনায় যাঁরা মেতেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন সোমনাথ সান্যাল। স্থপতি সোমনাথের হাতে গড়া রূপায়ণের মধ্যে ছিল এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য, আধুনিক স্থাপত্যের প্রকৃষ্টতম নিদর্শন। তাঁর সৃষ্টির মধ্যে খুঁজে পাওয়া তার প্রতিষ্ঠার এক বিশেষ ছাপ। স্থাপত্য শিল্পের তিনি বিচার করেন সামগ্রিক ভাবে—এই শিল্পের মাধ্যমে তিনি মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমাধানে সক্রিয় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন—

বর্ত্তমানে সোমনাথ সান্যাল শহরে বহুতল বাড়ীর স্বয়ংসম্পূর্ণ কক্ষ নির্মাণে তাঁর নিজস্ব পরীক্ষা নীরিক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন।

চার নং ট্যাঙ্কের পাশে রোটাণ্ডার সুষমামণ্ডিত শ্যামায়মান রূপটি তাঁর শিল্পীমনের পরিচয় বহন করে অগনিত পথিকের কাছে।
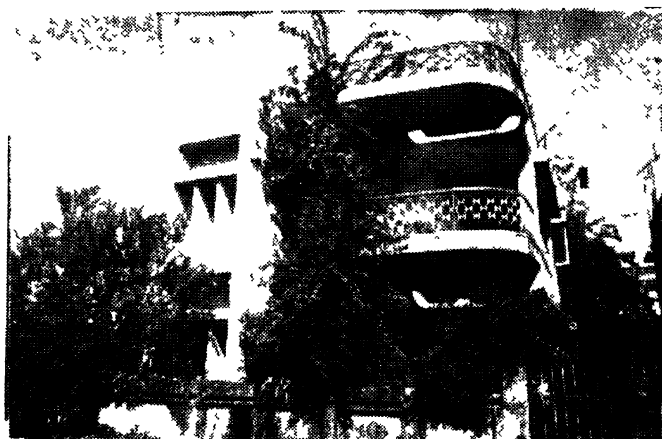
চন্দন মৈত্র

শিবপুর বি. ই. কলেজ থেকে '৬৯ সালে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করার পর চন্দন মৈত্র কিছুদিন সি. এম. পি. ও. তে ট্রাফিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ট্রেনিং নেন। তারপর ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনলজি দিল্লী থেকে এম টেক্ ডিগ্রী লাভ করেন '৭২ সালে ফাউনডেশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে। ভারতবিখ্যাত ফাউনডেশন স্পেশালিষ্ট এবং ন্যাশনাল প্রফেসর ডঃ টি. রামমুর্ত্তির কাছে। হাউসিং সংক্রান্ত দুটি International Conference Rotterdam এবং New Delhi তে তিনি খুব সক্রিয় ভাবে অংশ গ্রহণ করেন এবং তাঁর বক্তব্য রাখেন।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি সল্টলেকের প্রায় সব কটি সংস্থার সাথে যুক্ত, রোটারী ডিষ্ট্রিক্ট ৩২৯ এর সেক্রেটারী নির্বাচিত হয়েছেন ১৯৮৭-৮৮ সালের জন্য। এছাড়া বিধাননগর সুইমিং এসোসিয়েশন, অটো ক্লাব প্রভৃতি বহু সংস্থার সাথে সক্রিয় ভাবে যুক্ত।
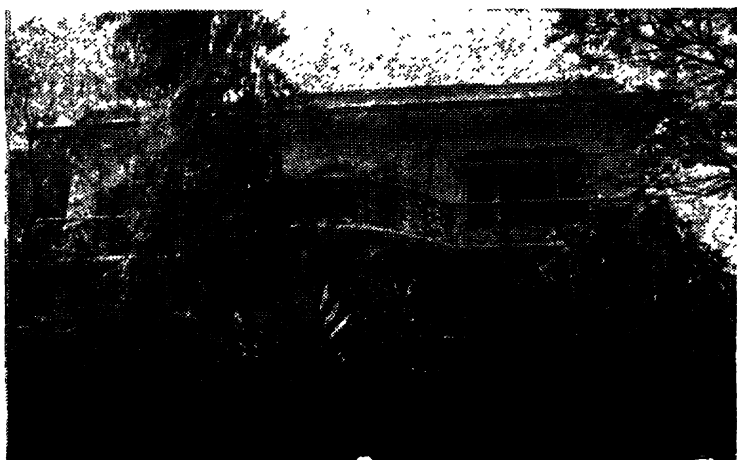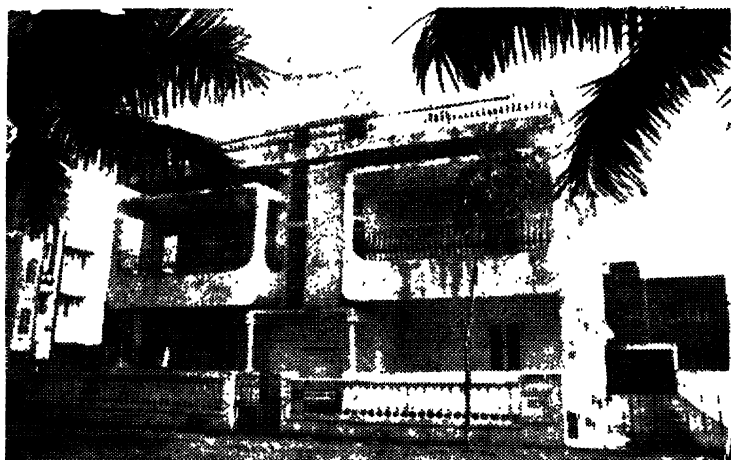
কুমার কান্তি মজুমদার

১৯৭১ সালে শিবপুর বি. ই. কলেজ থেকে বি. আর্চ ডিগ্রী লাভ করে জীবনের প্রথম অধ্যায়ে অভিজ্ঞতা লাভের জন্য বিভিন্ন ইঞ্জীনীয়ারিং প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন। এর মধ্যে দু-বছর ধরে একটানা কাজ করেন খ্যাতনামা 'চ্যাটার্জি-পোল্‌ক ফার্মে'—এরপর কিছুদিন সর্ব্বভারতীয় খ্যাতি সম্পন্ন এম এম দত্তর কোম্পানীতে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হন। এর মধ্যে কলকাতা মহানগরীর উপকণ্ঠে লবণ হ্রদ শহর বা সল্টলেক সিটি ১৯৭২ সাল থেকে শুরু করে তরতরিয়ে বেড়ে চলেছে। এই সময় সত্তর দশকে যে সব স্থপতি নির্মীয়মান এই শহরের রূপায়ণে এগিয়ে এলেন তার মধ্যে কুমার কান্তি মজুমদার অন্যতম। ১৯৮৭ সালে তিনি নিজের আদর্শে গড়ে তুললেন নতুন এক প্রতিষ্ঠান—নাম দিলেন 'হ্যবিকন' (Habicon—Human Habitation Construction) ১৯৭৭ সালে এর জন্ম—আজ ১৯৮৭-এই দশ বছরের বিধাননগরের বুকে সততা নিষ্ঠা ও স্থাপত্য শিল্প-নিপুণতায় হ্যাবিকন এক বিশেষ সুনাম অর্জন করেছেন। শ্রী কুমার কান্তির মতে সি বি ১৯৯ চিহ্নিত বাড়ীটি তাঁর অতি নিজস্ব আদর্শে গড়ে তোলা স্থাপত্য শিল্পের প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

বিধাননগরে নির্মীয়মান চলচ্চিত্র পেক্ষাগৃহ 'শিবম্'। শ্রী কুমার কান্তি মজুমদারের নৈপূণ্যের মূর্ত্ত প্রতীক।
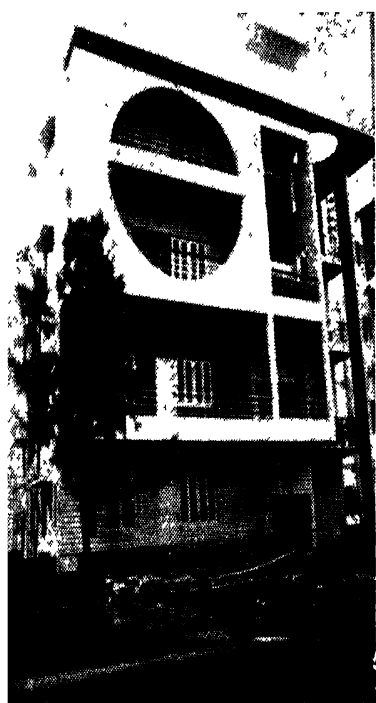
মেয়ে জন

আলা জন

ভেড়ি

গ্রীন ভার্জ

সেচভবন

করুণাময়ী

বি ডি স্কুল

বি ডি মার্কেট